

পর্যটন বিষয়ক মাসিক

যাত্রিক

পরিষদ পত্রিকা



আষাঢ়
প্রাৰণ



১৮৮৩

ପତ୍ରିକା ପରିଚୟ

এই পটিকাটি পঞ্চদশ তথা ষাটতমীর ইতিহাস, শিল্পকলা, ভূগোল, বর্ণন, ভাষাভাষা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক রচনায় ব্যাক।
পঞ্চদশ-বিংশ শতাব্দীর প্রকাশ এবং সাধারণ পঞ্চদশের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান এই
পটিকার দ্বারা উদ্দেশ্য।

विष्ठाप्त मयस :

অবশ্য-কাহিনী সত্য-নিষ্ঠ অবশ্য-কাহিনী এই বিভাগে প্রকাশিত হয়।

১৫-নিউন চারভাষা প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান ও হোটেলের পরিচিতি নিম্নবিত্তভাবে এই বিভাগে প্রচারিত হয়।

অধিদপ্তর : অর্থীঃ হটেল, খান, পান, লোখ, আবকাহি বিষয়ক তথ্যের লব্ধ এই বিভাগ।

কথা-কহনা এই বিভাগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শনাদি তত্ত্বিক রচনা তথা ক্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের পুনরাবহি প্রকাশিত হয়।

ভাষাভাষের চিহ্ন : ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর দ্বারা ব্যবহৃত ভাষাভাষের প্রতিনিধি (প্রতীক) বার্ড। এই বিভাগে পরিবেশিত হয়।

ବିଭିନ୍ନ : ନାନା ବିଷୟର ନୟ-ନାନା ଶ୍ରେଣୀଭିତ୍ତ ହେ ଏହି ବିଭାଗଟିରେ ।

ସାହିତ୍ୟିକ ଗବିଷୟକ ପତ୍ରିକା କୋଇଳ ସଂସ୍ଥାର ଦ୍ଵାରା ପଢ଼ାଯାଏ ।

ବୈଦ୍ୟାଦିକ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି

পণ্টন এবং ভারত-ভূমি বিখ্যাত মাদিক

ম্যট্রিক

পত্রিকা পত্রিকা



সম্পাদিকা : শ্রীমতী চন্দ্রা বসু

দ্বিতীয় বর্ষ । পঞ্চম ও সপ্তম সংখ্যা

সংস্কৃত-প্রাচীন । ১৯৮০ বঙ্গাব্দ ।

সম্পাদকীয়—

ভ্রমণ কাহিনী

সহস্রাব্দ অখ্যাত

চিত্রা থেকে হিত

পথ-নির্দেশ :

যদি যেতে চান । সময়নাথ ১৯০

রমা-রচনা :

ভারতের মন্দির

কাকীর দেবী-পীঠ

কিশোরদের জন্ত :

জাতক-কথা

ভাষ্যমাণের চিঠি

জিজ্ঞাসা :

প্রদ্বয় :

কথকলি মট

শ্রী চন্দ্রশেখর

শ্রী শত্ৰুঘ্ন চট্টোপাধ্যায়

বিভাগীয় সম্পাদক

একলব্য

ভানুদেব প্রতিমিথি

সম্পাদিকা

মুদ্রণ-ব্যবস্থায় বিপণনের দক্ষতা আশা-প্রাণে একত্রে প্রকাশিত হলো

সম্মানসূচী

যারা প্রমোদ ভ্রমণে যান তাঁদের মধ্যে প্রায়শঃ একটি ভাবনা প্রকট হয় যে, জীবন স্থানটির সবকিছুই তাঁদের থেকে ভিন্ন। সেই ধারণার বলি হয়ে তারা স্থানটির অনেক কিছুই বিরাগ সমালোচনাও করে আসেন।

উক্ত পর্যটকদের কাছে আমাদের একটি বিনীত নিবেদন আছে :

তারা যেন দৃষ্ট স্থানটির অধিবাসীদের জীবন-যাত্রার প্রভেদগুলি উপেক্ষা করেন এক তৎপরভাবে সাদৃশ্যগুলির অনুসন্ধান সচেষ্ট থাকেন। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও জীবন-দর্শন যে একই সূত্রে গ্রথিত তা যেন তারা বিশ্বাস না করেন।

ভৌগোলিক দূরত্ব এবং নৈসর্গিক কারণ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের জীবনের বহির্ভাগে অর্থাৎ বস্ত্র-ভোজনে বিভিন্নতা ঘটলেও অন্তর্ভাগে কান্দীর হ'তে অস্ত্রা-সুমারিকা, কুশ-কলহ হ'তে মণিপুর এক এবং অপর।

ঐ একই সেই আত্মিক বা আধ্যাত্মিক চিন্তার ও শিকারই কল হার অসাধারণ অবদান সমূহ সমগ্র পৃথিবীর বিনয়জনের প্রদান বিষয়।

যখন রেলপথ ছিলনা, মোটর গাড়ী ছিলনা, যাত্রাতারের উপযুক্ত পথেরও ছিল অভাব, সেইসময়ে ভারতের অধ্যাত্ম-চিন্তার আচার্যগণ পদব্রজে সহস্র সহস্র কোশ পরিভ্রমণ করে ভারতবর্ষে আত্মিক চিন্তার যে একীকরণ সাধিত করে গিয়েছেন তা অনুধাবন করলে বিস্ময়ে হতব্যাক হ'তে হয়।

তাঁদেরই ব্যাপক ভারতীয়গণ ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে প্রমোদ ভ্রমণে গিয়ে যেন ভারতীয় মহামানবের জীবনে প্রভেদ দর্শনে তৎপর না হ'ন।

পথান্নির অন্তবালে



শ্রী চন্দ্রশেখর

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

এই কাঠের কারখানাটা ?

: ওটা আমারই। নিজে আর একজন
আসিস্ট্যান্ট মিলে ফ্যানিচার বানাই। কোল-এর
বড়বড় দোকানগুলোয় বিয়ে আসি, তারা বেচে
পয়সা দেয়। আমি খুল ফাইনাল পাশ করে বেশ
কিছুদিন চাকরির চেষ্টা করেছিলাম। চাকরি
পেয়ে শেষে এই কাজ নিখলুম। তবে এটা আমার
আসল জীবিকা নয়। আসল হলো, সমুদ্রে মাছ
ধরা। এখন কয়েকদিন মাছ ধরা বন্ধ থাকবে।
এই অবসরে তাই কিছু ফ্যানিচার বানিয়ে বিক্রি

কথা বলতে বলতে সকলে বড় হাস্যরস মুখে এসে
পড়লো। ওখানে পেট্রোল পাম্প-এর মিটার বক্স এর
মতো কাঁচ ঢাকা একটি স্বচ্ছ যৌত্তর মূর্তি শোভা
পাচ্ছে। তার গায়ে আটকানো রয়েছে কয়েকটি
জবাকুল। গ্রামবাসীরা নিত্যা কুল দিয়ে যান।

চ্যাকো বললেন : সারা গ্রামের সাত ভাড়াগার

এই রকম দাঁত রয়েছে।

কুশিয়ার্ন।

চ্যাকোকে বক্তব্যম জানিয়ে বাস
ধবচে এগিয়ে গেলো অতঃপর, গিয়ে
চুকলেন তাঁর নিজের কারখানায়।

ফিরে এলো অতঃপর কোল বাস স্ট্যাণ্ড এ।

এখন কোথায় যাবেন ? অমিয় ভ্রমণে
চাইলো।

: এবার অল্প কষ্ট-এর বাস ধবে যাবো সেট ভক্ত
চার্ট দেখতে। এই তো বাস এসে পড়তে।

অদূরে একখানা বাস আসতে দেখা গেলো
গাড়ীটা ভবতি ছিল তবু কতৃষ্টিব কদের তুলে
নিগেন এং তুজন মোককে দাঁড় করিয়ে শেষকাল
জগ জায়গা করে দিলেন।

অতি অল্পসময়ে অতঃপর লৌভলো
জায়গার কাছাকাছি অল্প একটা স্টপেজ্ এ

সামান্য হাঁটুতেই পথের ডানপাশে কোল-এর
কাজবাড়ী। এখন এখানে সরকারী দপ্তর রয়েছে।

বাক্সবাড়ীর অন্তিমূর্ধিরে অষ্টমুর্ধি হ্রদ। হ্রদের
ওপরের ত্রিভুজটা পেরিয়ে যেতেই এলো পথের
বাঁদিকে সেন্ট জর্জ চার্চ। সেখানেই বোকা বার যে
ইমারতটি খুব পুরনো। ১৩৩১ হ'র ১২৮৮ খৃষ্টাব্দের
মধ্যে কোনও এক সময়ে অতিথিক, ভারতের প্রথম
রোমান ক্যাথলিক বিশপ, Fr. Jordanus
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গির্জাটি।

সেন্ট জর্জ চার্চ বেধে, ওরই সামনে থেকে বাস
ধরলো অতুলুরা। আবার নামলো গিরে কোল
স্ট্যাণ্ড-এ। এখানে বাস বদলে চলে গেল নৌটকর
পল্লীতে। অষ্টমুর্ধি হ্রদ ওরই কাছে মিশেছে সমুদ্রে।

যেখানে গিরে বাসুটা থানলো তার নাম
শক্তিফুলহর। বাসু স্ট্যাণ্ড-এর পাশেই অষ্টমুর্ধির
ওপরে একটা ত্রিভুজ। ত্রিভুজ-এর ওপাশটা নৌটকর
আর এপাশটা শক্তিফুলহর। মাহ ধরা এবং নৌকা
ও ডিঙি তৈরির একটা বড় ঘাঁটি এই নৌটকর।
কিন্তু সেজগৎ এর সমাদর নয়। সমাদর এইজগৎ বে,
এখানের মতো হ্রদের আর কোথাক সেখানে নয়
অষ্টমুর্ধি।

ত্রিভুজের ওপর সুদৃশ্য শেফালিরা অনেককণ
দাঁড়িয়ে বসলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেখানে লাগলো,
কেনন করে অষ্টমুর্ধি ছুটে গিরে নিজেকে মিলিয়ে
দিলে সমুদ্রে।

২ চার ।

কোল-এ ফিরে কোন বকমে প্রানাহারটা সেরে
নিয়, বেলা একটা ঘণের 'ডিবেল্লন্ প্যালেসটারটা

ধরলো অতুলুরা। হোটেল ছেড়ে দিলনা। কারন,
আবার কোল-এ ফিরে আসতে হবে ওদের।

: এবার আমরা কোথায় যাচ্ছি দাদা? শেফালি
কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

: যাচ্ছি আত্মতত্ত্ব গুতে। ইংরেজীতে জারগা-
টার পরিচয় অ্যাঙ্কেনগো নামে।

: কি আছে ওখানে?

: ওখানেই ইংরেজরা করলে তাদের প্রথম
ঘাঁটি করেছিল।

চৌত্রিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ওরা
যখন কটকাউন্স স্টেশন-এ নামলো তখন বেলা
তিমটে।

স্টেশন-এব গায়ে বাস স্ট্যাণ্ড। অতুলুরা
প্লাটফর্ম থেকেই দেখতে পেলো একথানা বাস
দাঁড়িয়ে আছে। একজন সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করে
জানলো ওটা অ্যাঙ্কেনগো-গামী। ভাড়াভড়া করে
ওরা ধরলো বাসুটা।

মিনিট পঁচিশ পরে একটা পথের বাঁকে ওদের
নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো বাসুথানা। বাঁদিকের
পাতার ছাঁটনি দেওয়া মেটে ঘরগুলোর সামনে দিয়ে
হাওয়া পথটা ধরলেন শেখরদা।

একটু যেতেই দেখা গেলো পথের ধারের
ঘরগুলোর সামনে শুকোচ্ছে বাঁশরাশি মাহ।

: এখানে মাহ শুকোচ্ছে, তার মানে সমুদ্র খুব
কাছে, তাই না দাদা? শেফালি জানতে চাটলো।

: হ্যাঁ, এই ঘরগুলোর পিছনেই সমুদ্র। আমরা
সমুদ্রের ধার দিয়ে চলছি বলতে পারো।

: এই মাহগুলো এরা কি করবে, নিজেরা
খাবে?

: মোটেই না। এগুলো কোল্ল: এ পাঠাবে, রপ্তানির ক্ষত।

দশ বাত্রে মিনিট ঠাঁটবার পরে ওরা পথের ধাঁদিকে দাঁড়ানো একটা অগ্নি বৃক্ষ চোকাব: গির্জা পেরিয়ে গেলো। আরও কিছুটা গেলে, ডানদিকে রপূব রঙের .একখানা নতুন পাকা বাড়ী পড়লো। ওটি হাসপাতাল। হাসপাতালের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে গারে কালো ছাঁতা-পড়া কেল্লার দেওয়াল।

বেওয়ারালের কোল বেঁবে ধাঁ দিকের সস্ত্র পথটার ধানিক যেতেই একটা পুলিশ-চৌকি। তারই সামনে কেল্লার ঢোকবার দরজা, ভালাবন্ধ।

শেখরদা পুলিশ-চৌকিটার গিয়ে বলতেই একজন লোক চাবি নিয়ে এসে খুলে দিলেন দরজাটা।

ক্রোকার ছাড়া কেল্লার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ভিতরে পড়ে আছে খোলা মাঠ।

: এ তো শুধু একটা মাঠ। কিছুই নেই এখানে। বললো শেফালি।

: না শেফালি, এর মাটিতে রয়েছে ইতিহাসের অনেক স্মরণীয় ঘটনার পদচিহ্ন। শেখরদা বললেন।

কেল্লার সামনে, পশ্চিম দিকে সমুদ্র। ব্যবধান আধ ফার্লংও নয়। তার কূলে কূলে বসতি,—গোটা পকাল নারকেল পাতার ছাঁটিনি দেওয়া কাঁচা-ঘর। সামুদ্রিক-ফসলের ভপর নির্ভরশীলরাই অর্থাৎ ধীরবকুলই এই সব ঘরের বাসিন্দা।

কেল্লার ভিতরে ঢুকতেই দেখা গেলো ছ' কোণে ছ'সারি সিঁড়ি, চওড়া ক্রোকারের মাথা পর্যন্ত উঠে গেছে। ডান দিকেরটি দিয়ে ওপরে গেলো অন্তহুতা।

: দেখো, দেখো কি স্মন্দর দেখাচ্ছে সমুদ্রটা! শেফালি হর্ষধনি করে উঠলো।

পড়ন্ত বোমের কিলিক-ওড়ানো রাশিরাশি চেইটের দেবার সমুদ্রকে মজ্জাই অশরুপ দেখাচ্ছিল।

: চলো না, আমরা ওই বেলীর মতো উঁচু জায়গাটার গিয়ে বসি।—

অন্তহুতে উদ্দেশ করে সকলকেই আহ্বান জানালো শেফালি।

ওরা দুজনে বসলো শেফালির পছন্দ করা জায়গাটার। শেখরদা ও অমিয় কাছে দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁর সেই খাতাখানার সক্ষর ততে পড়ে শোনালেন শেখরদা,—

সমুদ্রের গা বেঁবে এক ফালি জমি, মূল দু-খণ্ড থেকে এইখানে বিচ্ছিন্ন ছিল একটি নদীর দ্বারা। নদী ও সমুদ্রের মাঝখানে ঘাকা, চড়া গোছের সেই জায়গাটিতে, ১৬৮৪ খৃস্টাব্দে, আন্টিগল্-এর রাণীর অনুমতি নিয়ে ইংরেজ বণিকরা কেরল এসে তাদের প্রথম বাঁটি স্থাপন করে। তারা স্থানটির নামকরণ করে, আঞ্জেমনগো। ওর দেশীর নাম ছিল, আকুতেঙ্কু।

আকু মানে পাঁচ, তেঙ্কু বা রেঙ্কু অর্থে নারকেল গাছ। হয়তো নদী ও সমুদ্রের মাঝে এই মগণ্য চড়াটিতে সে সময়ে বাসিন্দা ছিল ত্রাশ পাঁচটি নারকেল গাছ, আর তাই হয়েছিল ওই নামকরণ। কিংবা এমনও হতে পারে যে, এখানে ছিল একটা পাঁচ-মাথা নারকেল গাছ। বাই হোক, বসতি স্থাপনের অনুমতি লাভের দু'বছর পরে, ১৬৯০ খৃস্টাব্দে, ইংরেজরা আন্টিগল্-এর রাণীর কাছ থেকে পেলো একটি তুর্গ নির্মাণের অনুমোদন। অচিরেই তুর্গ তৈরি শুরু করলো তারা।

ইংরেজদের এই অগ্রগতিতে অনুরবর্তী কোল্ল ও কোডি-এ ওলন্দাজরা প্রমাদ গুললো। তারা

রানীকে নানা কথার উৎসাহের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে লাগলো। ফলে, দুর্গট শেখ হওয়ার আগেই রানী সাহেবা ইংরেজদের আক্রমণ করে বসলেন। ইংরেজরা প্রতিহত কবলো সে আক্রমণ।

দ্বিতীয় আর একটি অভিযানেরও রানী সৈন্যদল পূর্ণবৃত্ত হলো। 'অস্তিত্ব' ও 'আজেনগের' মধ্যে ক্রমেই সম্পর্কের অবনতি ঘটতে লাগলো এবং তা'র সক্রিয় অংশ নিলেম পিত্তমার নামে এক জেদী লোক। তাঁর এক যোগদান বা যোগদান নামে আর একটি দল এই সময়ে এমনই প্রবল হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁদের চোখে এ অঞ্চলের রাজা, রানী ও কৃ-স্বামীরা ক্রোড়নকে পরিণত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় আক্রমণের কিছুদিন পরে, তাঁদেরই একজন অস্তিত্ব-এর রানীর প্রতিনিধি সেজে, আজেনগের দুর্গ-প্রাধানের কাছে গিয়ে রানীর প্রাণ্য বাহিক বাতনা চাটলেন।

তখন দুর্গের কর্ণধার ছিলেন মিস্টার Gyfford। তিনি ভাবলেন, ওই প্রতিনিধি হাতে না পারিয়ে নিজেই বাহেন রানীর পাওনা অস্বাভাবিক, যাতে করে বিরোধটোর মিটমাটের সুবিধা হবে।

রানীকে খুব সম্মান দেখানো হবে ভেবে তিনি দুর্গের উত্তরণস্থ সব কর্মচারীকেই সঙ্গে নিলেন এবং মুষ্টিমেয় যে ক'জন সৈন্য দুর্গে ছিল তাদেরও নিয়ে গেলেন।

অস্তিত্ব-এর বানিন্দারা সিদৌদের জানালেন সারব অভ্যর্থনা। রানী অত্যন্ত খুশী হলেন এবং সাহেবও রানীর সারব ব্যবহারে খুশী অভিজ্ঞত হয়ে পড়লেন।

আজেনগেরে ফিরবার সময় উপস্থিত হলো, কিন্তু মিস্টার Gyfford-এর সে রাতে ফিরতে ইচ্ছে

হলো না। তাঁর লোকজনের অপ্রত্যাশিত, এমনকি স্বল্প রানীর পরামর্শও উপেক্ষা করে তিনি সে রাতটো অস্তিত্ব এ কাটতে মনোস্থ করলেন।

দ্বিতীয় কয়েকটি বাড়িতে সাহেব ও তাঁর লোকজনের রাত্রিপাসের ব্যবস্থা হলো। গভীর নিশীথে তাঁরা সবাই পিত্তমারদের নিয়োগ করা বাতকদের দ্বারা আক্রান্ত ও নিহত হলেন।

এদেশী কয়েকজন অপ্রত্যাশিত অবস্থাতেই কোনরকমে আজেনগেরে পালাতে সক্ষম হয়েছিল; তারা ইংরেজদের দুর্গে প্রত্যাবর্তিত পৌঁছে গেল। দুর্গে সে সময়ে শুধু অকর্মণ্য বৃদ্ধ, শিশু আর মেয়েরা ছিল। আর ছিল গোলন্দাজ Samuel Ince। পিত্তমারদের এই হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী কার্যক্রম Ince সহজেই বুঝতে পারলো, এবং আজেনগের ওপর সম্ভাব্য আত্ম আক্রমণকে প্রতিরোধ করে দুর্গটিকে বাঁচাবার চক্র কোমর বাঁধতে লাগলো।

ভাগ্যক্রমে তখন তাদের একখানা কাছাকাছি আজেনগের কাছেই নোঙর করা ছিল। Ince সেই আহাঙ্গে নাবী ও শিশুদের বহন করে গেল যোগাই-এর পথে। মৃত Gyfford-এর স্ত্রী আকুতেজুগের গলিল ও অস্ত্রাশ্রয় প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র নিয়ে এই সঙ্গেই আকুতেজুগ ত্যাগ করলেন।

দুর্গের বাইরে তাদের যেলব কদাম-ঘর ছিল, Ince সেখান থেকে টাকাকড়ি ও অস্ত্রাশ্রয় সুলভান জিনিস সরিতে এনে দুর্গে রাখলো। তারপর কয়েক দ'বস্তা চাল, ছন ও শুকনো মাছ মজুত করে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলো তার বাহিনী নিয়ে। বাহিনী বলতে সে নিজে, কয়েকটি ছেলে, আর অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের নিয়ে মোট পঁচাত্তর জন।

অনিলবেই এলো প্রত্যাশিত আক্রমণ। দুর্গের বাইরের বসতিগুলি ধ্বংস করে ফেললো। পিরমারদের অসুচেরা, নিম্ন দুর্গের ওপর তারা নিয়মিত সৈন্য-বাড়িনী নিয়ে হেমন কোন আক্রমণ চালানো না। তবে, তেলে তেতানো অলস কান্ড-বান্দা নৌ৷ দিয়ে, দুর্গের পাতার ছাইনিচে আস্তন দরিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। এর ফলও ১০০০ টাঁরি ছিল। সেই রাতেই সে ছাইনিটি ভেঙে ফেললো। হুমাস দুর্গটি রইলো অচল হয়ে।

সাহাবারদ্র Inoe বোম্বাট-এ খবর পাঠিয়েছিল এপ্রিল মাসে, সাহাবা এলো অক্টোবর-এ। আগন্তুক মনের অধ্যক্ষ করেকটি শত্রুযুদ্ধ দুর্গ-অবরোধকারীদের পদুদন্ত করে দুর্গটিকে মুক্ত করলেন।

১৭২২ সালে আন্তিগল্-এর রাণী ও ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে এক শান্তি-পত্র স্বাক্ষরিত হলো। আকুতেজ্জু হীরেবীরে একটি চমৎকার বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রপে গড়ে উঠতে লাগলো। অচিরেই পন্ডির উপকূলে আকুতেজ্জু স্থান হয়ে উঠলো বোম্বাইয়ের পরকর্তী বিশিষ্ট বন্দর হিসাবে।

কালচক্রের আবর্তনের সঙ্গে ভারতের অগ্রগত বন্দরগুলি উন্নততর হয়ে উঠলো আকুতেজ্জুর প্রাধান্য ক্রমে হতে ক্রমশঃ হতে লাগলো এবং ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ একমাত্র 'রেসিডেন্সি' বা প্রশাসকের আবাস ভাড়া এখানে আর কিছুই রইলো না।

১৮০২ সালে ত্রিভুবনাকুর-এ বিজোহ দেশা মিলে বিজোহীদের দ্বারা আকুতেজ্জুর ইংরেজ বসতিটি অধিকৃত হলো এবং বেশ কিছু ইংরেজ প্রাণ চারালো। তবে ঐ বিজোহের নায়ক আত্মহত্যা করার উপস্থাপ শ্রীশ্রী দ্রোহিত হলো।

১৮১০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে আকুতেজ্জু স্বত্বাধারিত হলো রেসিডেন্ট-এর কাছে। আকুতেজ্জুর পরোক্ষন ফুলো,—ক্রমে সে কিরে গেলো '৭৬ পূর্বাধিকার।

দক্ষিণ মালবার উপকূলের প্রথম বৃষ্টি, জমজমাট এক বন্দর, যেন ঘড়ির কাঁটাকে টেনেদিয়ে ঘুরিয়ে দিয়ে হয়ে গেলো বিবর্ণ, নিঃশব্দ, নির্জন, ধীরবধের গ্রাম দ্বারা,—আজকের এই আকুতেজ্জু।

মৌন-বিশ্ময়ে অতঃপ ও খেলানি স্নানছিল এই অধ্যাত নাম না-জানা একটি গ্রামের চমৎকার উদ্যান-পত্রনের কাহিনী।

: অপরূপ আপনার ওই খাতাখানার সংগ্রহ !
আপনি লেখেন না কেন দাদা ? বললো অতঃপ।

: ছাপবে কে ! আর ছাপবেই বা কেন ?
অতঃপ চূপ করে গেলো। তার মনে হলো, কোথায় যেন গোপন কোন্‌ রয়েছে 'শেখরদাস'।

পৌনে পাঁচটা বেজে গিয়েছিল। ভাগ্যবান মিলো অমিয় : ওঠো ! চল্‌ অতঃপ।

তিন্তাথেকে তিন্তা

শ্রী শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

। পাঁচ ।

বেলনা বেলগাড়ীর আরো একটি মজা দেখছি —
উঁচুতে ওঠার সময় টিক্তনের কিককিক আওয়াজ শ্রব
শোনা যায় । কিন্তু ঢালু দিকে যখন নামে, সোর-
গোল তখন সব চুপ ! বিশেষ কিছু লাড়লেক থাকে
না টিক্তনের । স্টাট বন্ধ কোনো মোটর গাড়ীর
মতো । শু গড়িয়ে চলে যেন ।

যুব লম্বা, এতক্ষণ পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে ছিল
বেলগাড়ীর চড়াই । ট্রেন এবার নেমে চলেছে
উত্তরদিকের ঢালে । ক্রমশঃ উত্তরাট । হাই প্রায়
লক্ষ্যমাত্রায় গতি । এতদিক এসে সম্পূর্ণ ভিমালায়ের
রাজ্য । টৈনাং নুরে সমস্ত বাংলার নীল কিলিক
সেখের পাখো, তেমন অবকাশ আর নেই ।

কানিয়ারের পর, আরো ভলিল পর্বত-নিজ্জালে
প্রবেশ করেছে । পথের দৃশ্যে, ট্রেনের পর পাশা-
পাশি হুটী করনা আছে বড় সুন্দর । পার্কের মতো
সাজানো নিরিবিলা নিজনি জায়গা । আবার এই
কিছুক্ষণ আগে পার হয়ে এসেছি, দক্ষিণ সাজসজ্জা,
আরো এক কনো । তার নাম বাংলাখোলা ।

'খোলা' বোধহয় ভোট-খাটো নদীর নাম । গ্যাটক
যেতে যেমন পথে পড়ে সাংখোলা, রাণীখোলা ।
অথবা হল্পতো আকলিক ভাষায়, দীর্ঘ গতিপথের
সরনাকে বলে 'খোলা'—আমি ঠিক জানি না ।

পথের পাশে দু'ভাগিগায় কিছু লোক খুপ দেখে
এসেছি । আপনার দিলাতামের পরে, আর বাংলা-
খোলার আগে । শুকলো কি কোনো সাধু লামার
ভাসাংশেযক ওপরে তৈরী স্মৃতিচিহ্ন ? চোখ-আঁকা
পতাকা উড়ছে । লিবনেত্র । ওখানে যারা নিজা-
কাগরপের বাটরে চলে গেছে, খুলামাটিতে ঘিলে
খুলকণা হয়ে আছে, তারা কি এখনো দেখতে চায়
এই পৃথিবীর দৃশ্যভঙ্গ ? পতাকার যেন হুটে রয়েছে
তাদেরই অলৌকিক নগ্ন । ভটী সব সাদা ছুপের
নামের আছে গভীর রহস্য । শুকলোকে ছটেন বা
মণি বলে কার্ধ-কারণ বাই থাক, আমার কিছু
মনে হয়েছে চোখের মণির কথা ! এই জীবন, এই
সংসার, এই দৃশ্যভঙ্গের শেষ পরিণাম কী ? ওরা
বুঝি দেখতে চায় !

রংবুলের কুলজ রোপণের পাশ কাটিয়ে,

গাড়ী এসেছে ঘুম স্টেশনে। এবং ঘুমের পর, সামনে এখন বাতাসিয়া লুপ।

বাতাসিয়া লুপ। এই শব্দের ভিতরেই কী যেন আকর্ষণ আছে। তাই দার্জিলিং-ভ্রমণের কথা উঠলে, বাতাসিয়ার স্থায়িত্ব ভেসে ওঠে। এট আশ্চর্য লুপের ছবি না তুলে, ফিরে আসে না কোনো শব্দের ক্যামেরা। রঙিন পিকচার পোস্টকার্ড আর ফটো-এ্যালবামে অবশ্যই থাকে এই লুপ, বাতাসিয়া।

বাপারটা হবে কী ?

অসীম কোডুহল নিয়ে ট্রেনের জানালা থেকে যত দূর সম্ভব খুঁকে দেখতে চেষ্টা করি।

পাহাড়ের জটিলতা এখন সরে গেছে। এক বাপ নিচের রাস্তা বাক নিয়েছে অর্ধচন্দ্রে মতো। তার পালে, গুপ-পালে আঁকা বাঁকা সাপের মতো এই রেললাইন। যেন অজুত কুণ্ডলী পাকিয়ে, একটা ছোট মাঠের শরীর পেঁচিয়ে বহুতে চেষ্টা করেছে। মাঠ—অথবা কি বলবো ছোট্ট এক টুকরো উপত্যকা ?

গাড়ী হয়ে গেছে ধমুকের মতো বাঁকা। বাতাসিয়া লুপ পার হয়ে যাচ্ছি। মুক্তি ক্যামেরায় তোলা ফিল্মের মতো ঘুরে যাচ্ছে দৃশ্যপট। মনে হলো একবার, আমরা যেন স্থির হয়ে আছি—জানালার বাইরে ঘুরছে শুধু নীল পাহাড়, বিগল্লবোনা চমৎকার।

লুপের পর, গাড়ী নেমে চলছে আরো নিচে। আর, আমরা এখন নিচে যাচ্ছি বলেই, ভারী শুল্কর গাছপালা বৃক্ষমন্দির নিচে, ভরিয়ে একটা পাহাড় ক্রমশঃ যেন উঠে যাচ্ছে আকাশের কাছাকাছি। ওটা বৃষ্টি ঘুম মনেটারা। কী শুল্কর দেখাচ্ছে এখন।

কিন্তু এক সেকেন্ড আগেও বৃষ্টি পড়িনি, এবার পরম বিষয় আমার সামনে এসে পড়েছে। কাগজোরার এসে আস্তা আট গ্যালারীর কাছে বাক ঘুরতে গাড়ী। আর সামনে ডাকিয়ে আমি জরু।

পূরে ভীত সাধা, মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে বকমক করছে যেন আশ্চর্য এক জীৱক-সমুদ্র। তার বুকে তুষার পুতুলি—একটার পর একটা কী অসামান্য চেটে তুলে গেছে।

অনিবচনীয় তার শোভা।

দেখে আমার চোখে পলক পড়ে না।

এদিকে নীল-সবুজ পটভূমিতে, দার্জিলিং শহরও এবার ভড়িয়ে দিয়েছে তার ত্রণের মারাভাল।

পশ্চিমবঙ্গে এমন একটা তুষার আছে, তা' কি আগে জানতাম।

এ কোনো আবেগের কথা নয়। এ-বখা সকলেই জানে, হিমালয়ের শৌর্য অকল্পনীয়, ধারণাতীত। তার দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে আছে আরো কত বহা নিসর্গলোক। কত বর্গশব্দ রমণীয় জনপদ। সব সত্য। কিন্তু সে সব তো আমার পশ্চিমবঙ্গের নয়। অথচ আমার ঘা' আছে, তাই বা কম কিসে ?

এই যে বিশাল হিমালয়, পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতমালা, যার বৈদ্যু প্রায় ১৪০০ কিলোমিটার আর প্রস্থ ১২০ থেকে ৪০০ কিলোমিটার—যে হিমালয় প্রায় ৪ লক্ষ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে চিরকালের বিষয় হয়ে আছে তার ? বিখ্যাত শ্রুতিজ্ঞ এতগুলি তুষার শৃঙ্গ একসঙ্গে এক নজরে দেখা যায় কোথা থেকে ? কী আশ্চর্য, শুধু এই দার্জিলিং থেকেই। আর কোনো বিউটিফুল ভিউ-পয়েন্ট

থেকে নয়। সারা পৃথিবী তাই ছুটে আসে এই লহরে! তবে পশ্চিমবঙ্গের গৌরববোধ কি অস্বাভাবিক?

মাজিলিঙের টানে এত যে ছুটে আসা—আমার চোখের সামনের যেমন একটি ঘটনা এখানে বলে নিই।

প্রায় তিন মাস পর্বে আমার মাজিলিঙে এসেছিলাম। মার্চের সেই দুপুরে ম্যাল থেকে বেড়িয়ে, যখন বিকেল, সোজা হাঁটতে-হাঁটতে জলাপাহাড়ের দিকে আমি যাচ্ছি। এমিকে আগ্রহ কখনো আসিনি। তাই কিছুটা অলস আর কিছুটা পথের নিশানা চিন্তাস্য কবে, বস্তু দৃশ্য দেখে আসতে পারি।

জলাপাহাড় (৭১০ ফুট) আর কাটাপাহাড় (৭৮৬ ফুট) কলর দিকে নিবিড় এলাকা। ওই পাহাড় দুটির ওপরে আছে মিলিটারী ব্যারাক। তাই এখানে সাধারণ জনগণের প্রবেশ নিষেধ।

কেন-কেন তবু দেখিগেই যাচ্ছি। যতক্ষণ বাধা না পাই, উঁচু থেকে দেখে নেওয়া মাজিলিঙ লহরের দৃশ্য। বার্লস্‌ আউ ডিউ। নিচে মাজিলিঙের উচ্চতা ৬৮২ ফুট।

সেই পথে আলোপ হলো প্রাণে-জুল একদল স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে। তাদেরও লক্ষ্য দেখি ওইদিকে।

কলকাতার হওয়াস্ট্রাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ছাত্র বরা। প্রাক্কসরের সঙ্গে জলাঢ়া বিদ্যাব্রত প্রব্রত দেখতে গিয়েছিল। তারপর বল থেকে ছিটকে এই কক্ষন চলে এসেছে মাজিলিঙে।

ওদের হঠাৎ কলকাতার সঙ্গে আমাকেও অনারগে ভাবিয়ে নিলে। মাজিলিঙ সম্পর্কে আমি যাট্টুকু জানি, নানা প্রাণে তার উত্তর দিতে-দিতে চলেছি।

ওরা নোটবুক কিছু লিখেও নিচ্ছে। ছাত্রাবদন বনপথের শেষে আরো খানিকটা উঠে পড়েছি তখন। নিচে মাজিলিঙ যেন বিলাতী রত্নিন ছবি। আর তখনই হঠাৎ সামনে দেখা গেল সেই শেষ সীমারেখা—প্রাণেশ নিষেধ।

এই পর্যন্ত এসে, এইবার কিভাবে তো হবেই। তবু একটু চেষ্টা করতে যোগ্য কি? আমি অবশ্য অনেকক্ষণ থেকে ব্যস্ত করছি, তবু ওরা এগিয়ে গেল একেবারে মিলিটারী এরিয়ার পেট পর্যন্ত। তার আগে নিজেরা শান্তভাবে আলোচনা করে, ক্যামেরা আর নোটবুক, সঙ্গে যা' ছিল—সব কিছু পকেটে রাখলো। সিদ্ধান্ত হলো, কোন রকম ছবি তোলা অথবা কিছু নোট নেওয়া হবে না। তারপর বল বেঁধে গেল সামনে।

একজন পকেট থেকে ফটো-কার্ড ইত্যাদি কী সব বার করে, মিলিটারী গার্ডকে বোকাতে লাগলো—আমরা স্টুডেন্টস্‌। টেকনিক্যাল ট্রেনিং নিচ্ছি। এই ছাখো সরকারী ছাপ। সামগ্র্য একটু ঘুরে-ফিরে দেখে চলে আসলো। ভেতরে যেতে দেবে?

ভর লাগছে এদিকে আমার। কিছু ফালসফি হবে না তো? সরকার নেই, যেতে পারে ওরা যাক। আমি ভিতরে ঢুকবো না।

আশ্চর্য ব্যাপার। কী কুৎসে জানে, মিলিটারী গার্ড এবার রাস্তা ছেড়ে নিলে। সময় দিলে পনেরো মিনিট। তার মধ্যে গেটে ভিতরে আসতে হবে।

আমি ভেবেছিলাম বাবো না। কিন্তু আমাকে রেখে চলে যাবে, ওরা কি সেই ছেলে? বললে—সে কি কথা? এক যাত্রার পৃথক ফল হবে কেন? আপনিও আমাদের সঙ্গে আনুন।—ও তাই, ইনি আমাদেরই লোক। এঁকেও যেতে দাও।—

এই সব বলে, শেষ পর্যন্ত আমাদের ঠিক ম্যানেজ করে নিলে !

তারপর গেট পেরিয়ে যতদূর গেলাম আর যা' কিছু দেখলাম, সে-কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে একথা ঠিক, এই তরুণ মলের সঙ্গে দেখা না হলে, জলাপাহাড় আর কাটাপাহাড়ের সংরক্ষিত এলাকা দেখা কখনো সম্ভব হতো না।

আমরা ফিরে এসেছিলাম অবশ্য আধ ঘণ্টা পরে।

এখন বুঝতে পারি, শুইভাবে ক্যাম্পের তিতের ঘাওয়া আদৌ উচিত হয় নি অনেক কিছু বিপদ হতে পারতো সেদিন।

জলাপাহাড় থেকে নেমে আসতে সন্ধ্যার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়লো পাহাড়ে-পাহাড়ে। আলোর জোনাকি টিপটিপ, শহর দাঙ্গিলিঙ রহস্যময় হয়ে উঠলো ক্রমশঃ। গুপের হোটেল ফিরে এসে কিছুক্ষণ গল্প, চা আর বিদ্রুট। তারপর একসঙ্গে আবাস বাজার পর্যন্ত এসে, হাসিমুখে বিদায়-নমস্কার।

ওরা চলে গেলে, আমি কিরছি নিজের আন্তানায়—তখনি পথে আর একজন যুবক আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। পাশে তার আর একজন সঙ্গী।

ইংখ লঙ্কিত হয়ে বমকে দাঁড়ালাম। চেহারা দেখে মনে হলো বাঙালী নয়। কী ব্যাপার এমন পথ আটকালা কেন ?

যুবক ইংরেজী আর হিন্দী মিশিয়ে বললে—খুব বিপদে পড়েছি আমরা। একটু সাহায্য করবেন ? দয়া করে—

যাক বাবা, বিপদ তাহলে আমার নয়। রকে ! বললাম—কী হয়েছে কী ? বিপদটা কিসের ? এবার যে-কথা শুনলাম কোনোদিন কল্পনাও

For
Everything in Mill Stores
&
Engineering Industries

★

**EASTERN ENGINEERING
STORES**

40, Netaji Subhas Road,
CALCUTTA-700001

করিনি তা'। এই যুবক—মাস্টারী লেখক মতি বাস। পুণ্যর থাকে। ছোটবেলা থেকে দাঙ্গিলিঙের নামডাক শুনে, তার চুম্বিত হয়েছিল খুব। বাবু মণিবাগ-ভর্তি টাকা নিয়ে হাওড়া স্টেশনের দাব-ওয়ে দিয়ে আসছিলেন। পকেটমার হয়ে গেছে তখন। তারপর পুলিশ বলেছে, টাকা গোছে কিন্তু হাতে এখনো এ্যাটাচি আছে। আর ঘণ্টা বানেক কলকাতায় থাকলে গুটীও যাবে। তোনাকেকও আর খুঁজে পাওয়া যাবে কি না কে জানে ! এখনো সময় আছে সরে পড়ো !

তা' সরেই পড়েছে মতি বাস। হিপ-পকেটে ছিল পঞ্চাশ টাকা। সেই রাতের গাড়ীতেই সোজা চলে এসেছে দাঙ্গিলিঙ। হাতে এখন আছে সর্বমোট ছ'টাকা বারো আনা।

কিন্তু পুবার দিকে না দিখে, দাঙিলিঙে এসেছে কেন মতি? পাগল ছাড়া এমন কাজ কেউ করে?

কিন্তু জিজ্ঞাসা করবে কি! মতি বাস নিজেই বিপদের কথা ভাবছে না। ট্রুট-লাইটে চকচক করছে তার চোখ দুটো। হুংখের নদ—গভীর আনন্দে। তার অজ্ঞানের স্বপ্ন দাঙিলিঙে। সেই দাঙিলিঙে আজ সে এসেছে! শেষপন্থ আসতে পেরেছে! এটা যেন জিৎ!

এই মাহুঘটাকে কী বলবে?

এদিকে তার পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে একজন বাঙালী হুক গুর নাম বিজয়গোপাল। পূর্ববাংলার দিকে কোথায় বাড়িঘর ছিল। এখন কিছু নেই। কাজ করতে জলপাইগুড়ির কোনো এক আনারস-বাগানে। মালিকের সঙ্গে কী খিটিখিটি হয়েছে ছুম করে কাজ ছেড়ে দিয়েছে আজ এবং আজই সোজা চলে এসেছে এই দাঙিলিঙে। কেন? তা' সে নিজেও জানে না।

তবে একটা ব্যাপার তেরে গেছে। এখানে শ্রীতের কানড় কী রকম। সামান্ত স্ত্রীর চাদরে ঠেকানো থাকে না। এখন সকালটুকু হওবার অপেক্ষা। এখানে চাকরি খুঁজে আর কাজ নেই। পালিয়ে যাবে।

রাস্তার পাশে সরে দাঁড়িয়ে চুটো ফুটুর কাণ্ড শুনছি। হাসলে কি, মতি ব্যাসের সঙ্গে শুধু টেরেলিনের জামা। তার চাদরও নেই। কনকনে হাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে ছলনাই কাঁপছে অথব পাতার মতো।

মতি ব্যাসকে বললাম—তুমি একজন লেখক হয়ে এমন কাজটা করলে? পঞ্চাশ টাকা হাতে

ছিল, তবু বাড়ির দিকে গেলে না। অচেনা বিদেশের দিকে কাঁপ দিলে?

—লেখক বলেই তো এডটা বেহিসেবী হতে পারি। থাকে মন দিয়েছি, তার জন্য হুংখও সহ্য করতে পারি।

—কাকে মন দিয়েছো?

—কেন, এই দাঙিলিঙকে! আজ বিকেলে এসেই দেখেছি—উঃ, কী জন্মের এই দেশ! মেঘের আড়াল ছিল বলে বরফ-পাহাড় অবশ্য দেখতে পাইনি। অসুত তার জন্যও আজ রাতটুকু এখানে আমাকে থাকতে হবে। তাই আপনার সাহায্য চাইছি। বাবো না কিছু। শুধু থাকবো একরাত্রি। খোলা আয়তায় থাকলে ঠান্ডা লেগে হয়তো মারা যাবো। এদেশে মার্চ মাসেও এত ঠান্ডা হবে, আগে জানতাম না। তাই, বলছি কি—

বললাম—এসো। দেখি কী করা যায়।

ছলনে গুটিগুটি হেঁটে এলো আমার পিছনে।

একটা ধর্মশালা খুঁজে বার করা হলো শেষ পন্থ। কারণ ছলনকে হোটেলের নিরে বাবো, ততবেশি টাকা আমারও হাতে নেই। অফিসের কাজে এসেছি, হিসাবমত খরচে। তাই ধর্মশালা ছাড়া ওদের উপায় কি?

কিন্তু অনেক সাধ্য-সাধনা করে যে-ঘরটি পাওয়া গেল, তার উত্তরদিকে একটি মাত্র জানালা এক সেই জানালাটির একটি পাল্লা নেই। হুংখের হাতি কি এমনি সব দিক ভেঙেই আসে? আশ্চর্য।

ধর্মের সঙ্গে কতটা সম্পর্ক আছে, জানি না—আমাদের দেশের ধর্মশালাগুলি কিন্তু দারুণ কৃচ্ছ্র-সাধনের আবরণ। এখানে জল-মূল-অন্তরীকে যেন

নবকের আভাস। যা' কিছু দৃশ্যমণ্ডল, সবট
ভীষণ-ভয়ানক।

জানালার পর, চৌধ পড়লো ঘরের মেসেজ।
যত রাজ্যের জজাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বাপার
মাঠেব সংস্করণ। আর কী এক রকম দুর্গন্ধ কমে
আছে চার দেওয়ালে, পানের পিকে।—মোনবাস্তি
ছেলে এক নজর দেখে, ঐত হলান।

মতি ব্যাস বললে—এ গন্ধ কিন্তু ইউরিনের।
ঘরের ওই কোণটা দেখুন। এখনো কমে আছে।

বিজয়গোপাল ক্রান্ত হয়ে উক্তাপোশে বসেছিল।
উঠে দাঁড়িয়ে বললে—উঃ, কী ছারপোকা!

মতি ব্যাস আবার বললে—এই রাইটায় কথা
আমি লিখবো।

—তা' তো লিখবে বন্ধু, তার আগে বাঁচো।
তোমাদের তো কিছু নেই। দাঁড়াও, আমার কবল
ছুটো নিয়ে আসি। আজ তোমাদের সঙ্গেই
আমার নিষায়ণ।

—তার মানে?

—ওটা একটা বাংলা কথা, মতি ব্যাস, একটু
ঘরো তো উক্তাপোশটা। এদিকে সরিয়ে আনি।
আমিও আজ এ ঘরে থাকবো। তোমরা কেউ
গান জানো? কিংবা হাসির গল্প? ঠিক করে
রাখো। আমি আসছি। রাত জেগে সময়
কাটাতে হবে তো। আর ছু'প্যাকেট সিগারেটও
নিরে আসি।

তারপর সেই দীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক রাতিও এক
সময়ে ভোর হয়েছিল।

টানাটানি ছুটি কবলের নিচে তিনজন মানুষ।
শেষ রাতে ঘুমের ঘোরে বেন এক শরীর। এক
প্রাণ। পরিত্যক্ত অপরিচয়ের সীমারেখা নেই।

To ensure
More Water
Use



GLAND PACKINGS

**United Industrial
&**

Engineering Co.

27 2-D, Strand Road,
Calcutta-I

Phone: 22-8703

Gram: SOFTHARD

তাই ভোরের প্রথম আলোর গুহ্র হুবার শৃঙ্গগুলি
দেখে, আশ্চর্য্য হয়েছিল মতি ব্যাস। হেঁচক করে
উঠে বলেছিল—ঠিক আমাদের মতো পাশাপাশি
ওরাও রাত কাটিয়েছে, দেখুন চট্টোপাধ্যায়, কী
চমৎকার শিবরগুলো!

আমি কিন্তু তখন দেখছিলাম মতি ব্যাসকে।
হিমালয় তাকে কী রকম অদৃশ্য টানে পুণা থেকে
এখানে এনেছে!

মাঠের কথা থাক। এখন ভিমেঘের আবার
ফিরে আসি।

ট্রেন এসে দাঁড়ালো দার্জিলিং স্টেশনে।

কলকাতা থেকে ৪৫৫ মাইল। দিলিগুড়ি
থেকে ৫২।

প্রথমে গিয়ে উটলাম সেটাল বোর্ডিং হোটেলে।
কিম্বারের কোনো কথাই আসে না। হাতছানি
দিলে নীলাভ শহর। পার্ঘত্য আকাশ। তাই দশ
মিনিটেই আবার আমি পথে। অফিসের কাজ
সারতে হবে আগে। তার জন্য ঠিকানাও খুঁজতে
হবে। কোন্ পাছাড়ে লুকিয়ে আছে সেই বাড়িটা,
এখনো জানি না।

বাজারের দিকে যেতে-যেতে দেখলাম, হোটেলের
খুব কাছে একটা রোপওয়ে। রুপুলে যেমন দেখেছি
এখানেও তেমনি, শুধু মাল বহন করে এই রোপওয়ে।
রাতশ্রীর যেমন। ঘাত্রাবাহী তেমনি রোপওয়ে
দাঁড়িলিঙে আছে। তবে সেটা অল্প দিকে।
নর্থ পরেতে।

কিন্তু বাজারে এসে কে বলবে এটা পশ্চিমবাংলা।
সব মুখ পার্ঘত্য জাতির হাঁচে-গড়া। রত্নিন পশমের
পোশাক, কলমলে দোকান—সব কিছুতেই কেমন
যেন বিদেশ-দূর্য হুটে আছে। বাপে-বাপে উঠে
গেছে শহরের বাড়িঘর। সেখানেও বিলাতী হাঁচ।
আর কী গাছপালা এই শহরে। ঠাস-বুনন সবুজ-
কালচে সবুজেই যেন সাদা নকশা—ঐ অট্টালিকা-
গুলি। তাই চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের পাশ দিয়ে উঠে
এলাম একটা ওপর-রাস্তায়। তারপর বানিক
এগিয়ে, কোথা দিয়ে কে জানে, এসে পড়লাম
মিউজিয়ামের সামনে হঠাৎ।

হাতের লম্বী তবে ছাড়ি কেন? চুকে পড়লাম
ভিতরে।

কলকাতার জাহ্নবর যে দেখেছে, তার কাছে
কিন্তু নয়। কিন্তু হিমালয়ের প্রাণী-জগৎ সজ্জা, এক
নজরে নিখুঁত আয়োজন দেখতে হলে, এখানে

আসতে হবে। কোন পাখি কত উজ্জ্বল থাকে?
হিমালয়ে হিংস্র জন্তু কত রকম? এত শীতের
জলেও থাকে কোন্ জলচর? জানার কি শেষ
আছে? হিমালয়ে বড়-বেরঙের পাখি আছে পাঁচ-
ছ'শ রকম। বিভিন্ন ধরনের ফড়িং আছে দু'হাজার
রকমের। আর উদ্ভূত রত্নিন প্রজাপতি? তাদের
জাতি-ও ছ'শ। বড় ড্রাগার টেনে-টেনে বেধি, সাদা
কার্ডে পরিচয় লেখা, পিন দিয়ে গাঁথা আছে কত
রেশমী বর্ণ সুবাস। সত্য প্রজাপতির পাখা।

জাহ্নবর থেকে বেরিয়ে এসে, এবার অফিস।
ঘর সঙ্গে দেখা করবো, সেই অফিসার নেই। টুারে
গেছেন। অর্থাৎ ছুটো দিন আমাদের দাঁড়িলিঙে
থাকতে হবে। এ-বেশ এক রকম ভালই হলো
দেখছি। ম্যালের দিকে যেতে-যেতে এখন ভাবছি,
অফিসারের সঙ্গে দেখা হলেও তো থেকে যেতাম
হুঁদিন। কাজ সারবো আর গাড়ীতে উঠবো—
দাঁড়িলিঙ থেকে? অমন কাজ কেউ করে!

হাটতে-হাটতে, এসে পড়লাম গভর্নর হাউসের
কাছে।

নির্জন রাস্তার ওক পাইন বার্চ আর পপলার
গাছের আলোছায়ার বোড়া ছুটিয়ে বাজে করেক
জন উজ্জ্বল যুবক-যুবতী। লাগাম ধরে পাশে
সোড়স্কে বোড়ার মহিস। জুটিয়া বালক। ভ্রমণ-
কারীরা ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া নেয় এই সব টাটু-
বোড়া। যদি ইচ্ছা হয়।

ডানদিকে উঠে গেছে মহাকাল চূড়া। শিকিহী
জুটিয়ারা ওই মহাকাল মন্দিরকে বলে 'দাঁড়িলি'
অর্থাৎ ইঞ্জের বজ্রের স্থান। সেই থেকে এই
জাহ্নবর নাম হয়েছে দাঁড়িলিঙ।

মহাকাল মন্দিরের পাছাড়ে দেখা যাচ্ছে টুরিস্ট-

লজ। দৃষ্টি আমার ডানদিকের পাগড় থেকে সরে
এলে ক্রমশঃ বাঁদিকে ফিরছে।

চঠাৎ আবার সেট নিশ্চয়। স্থির চীৎকার-সমুজ
অদূরে। একটার পর একটা তুষারমৌলী ধানসু
শিখর! তরঙ্গমালা জলছে।

তবে এবার যেন আরো স্পষ্ট আরও কাছে।

ধমকে লাড়ালাম। সকলে যেমন লাড়ায়।

ভাবার অতীত যার বর্ণনা, তাকে আমি কী
বলবো? বুঝতে পারি না। কিছুকণ পরে পায়ে
পায়ে এলাম একটা বেকের কাছে। সিমেন্টের সবুজ
ছাউনি। আর সেখানে রঙিন সিমেন্টেরই নকশা
একে দেখানো হয়েছে, সামনে এখন দৃশ্যপটে কী
আছে। অর্থাৎ নয়নাভিরাম কোন্ কোন্ শিখর
দেখা যাচ্ছে এখন থেকে।

ছবির নির্দেশমত মিলিয়ে দেখি—

কাকনজঙ্গা ২৪১৫৬, পশ্চিম ২২-১০, জপুনো
১৯৫৩০, নরসিং ১৯১৩০, সিনিয়লহু ২২৬০০, কাক
২৪০৬১, রাউন্ড ২২০০০, কুস্তকর্ণ ২৫২২৪ ফুট।

চিনতে আর কিছু অসুবিধা নেই। এমন
গাইড আর কোথায় পাবো। তাই নতুন করে
দেখি।

আমার ঠিক সামনে কাকনজঙ্গা এখন আকাশেরথায়
মাত্র ৪৫ মাইল দূরে। সামনে কোনো অবরোধ
নেই। তাই মনে হচ্ছে চীৎকার করে কারো নাম
ধরে ডাকলে হয়তো ফিরে আসবে তার প্রতিধ্বনি।
এত কাছে সব! মনে হচ্ছে আমার।

[ক্রমশঃ]

নীলাদ্রিশেখর বসু'র

কাব্যগ্রন্থ

হিপি

ইন্টেলেক্চুয়াল্‌স্

৩'০০

-ঃ প্রকাশক :-

। বেঙ্গ প্রকাশ ।

৩৬৬-এ, সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রিট
কলিকাতা-৬

-ঃ পন্ডিতবিশ্বক :-

দে বুক স্টোর্স

এবং

কথা ও কাহিনী

১৪, বক্সিম গ্যাটার্ডা ষ্ট্রিট,
কলিকাতা-১২

যদি যেতে চান

॥ অমরনাথ ॥

বিভাগীয় সম্পাদক

[এ বছর অমরনাথ পর্বের নির্দিষ্ট তারিখ প্রার্থী পূর্ণিমা, ১৪৩০ প্রাপ্ত। টায়েন্সি ২৪ অগস্ট।
সরকারী অনুষ্ঠানে পহলগাঁ থেকে পহলগাঁ ৩৬ টার ৬টি অগস্ট। যারা এই যাত্রার অধীভুক্ত হয়ে যেতে চান
। অগস্ট ৩৬তিন দিন আগে পহলগাঁয়ে উপস্থিত হয়ে সরকারী যাত্রা অধিশাষের পর যোগাযোগ করবেন।
যারা প্রার্থী পূর্ণিমার কয়েকদিন পূর্বেই পর্বের কথা জানতে চান তাঁদের ক্ষর নিম্নলিখিত পথ-নির্দেশ।]

১. নির্ধষ্ট

১ম দিন :

বেলা ১১.৪০ মিনিটে ১৭নং আপ, জম্মু
এক্সপ্রেস্‌ যোগে শিখলগড় ত্যাগ।

২য় দিন :

পথে।

সকাল ৮.৩৪ মিনিটে লঙ্কো,—১৩।১৪৪
বারেলি,—রাত ২০.০০ টায় সফারপূর।

৩য় দিন :

সকাল ৭.৩৫ মিনিটে জম্মু। সন্তোষে
গর্ভবর্তে ট্রান্সপোর্ট -এর যে বাস পাবেন তা' ধরে
পহলগাঁ পৌঁছতে পারবেন সেমিনষ্ট রাতে। কিন্তু
বৃষ্টির তরুন রাত্তা ধারাপ থাকলে মাকপথে কুদ,
কটোত বা রামধাপ-এ রাত্রিবাস করতে হতে পারে।

৪র্থ দিন :

জম্মুর পৌছাবেন পহলগাঁ।

রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করুন কোনও হোটেলে।
যাত্রা করার বেল কিছুদিন পূর্বে পর্যালোচন করে

নিয়োক্ত হোটেলগুলির পছন্দমতো একটিতে স্থান
সংরক্ষণ করিয়ে যেতে পারলে ভাল হয় :—পহলগাঁ
হোটেল, কান্দীর হোটেল, পূর্ণিমা হোটেল, অন্নল্যাও,
নটরাজ, মাউন্ট, ভিউ, রক্সি ও টুইস্ট, হোটেল।
জম্মু কান্দীর গভর্নমেন্ট, ট্রান্সপোর্ট-এর ডোমি-
উকিতে অতি অল্প বায়ে থাকতে পারেন। শিখদের
শুল্কধার অতিথি-নিবাসেও থাকা যেতে পারে।

হোটেল ঠিক করেই চলে যান অমরনাথের পথে
তিনদিন এবং ফিরতি-পথে একদিন রাত্রিবাসের
ব্যবস্থা করতে। রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হিসাবে পহলগাঁ
থেকে তাঁবু ভাড়া করে নিয়ে যেতে হয় এবং তা'
নগরের জঙ্গ ঘোড়া অবস্থ প্রয়োজন। যারা তা'
করতে চাননা বা করতে পারবেন না তাঁরা বিকল্প
একটি ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারেন। কয়েকজন
ঠিকাদার জীবনী পূর্ণিমার বেশ, কয়েকদিন আগে
থেকে চন্দন-বাড়ী, জোজপাল, বাহু-যান, ও পক-
ত্তরনীতে তাঁবু বাড়িয়ে ভাড়া দেন এবং ধাবারের
দোকান খোলেন। পহলগাঁয়ের কয়েকটি হোটেল

বহি যেতে চান

ওঁদের এজেন্টেরূপে কাজ করেন। বাস্‌ স্ট্যাণ্ড-এ কুলিদের কাছে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন এ বছর কোনকোন হোটেল এজেন্ট।

ওই এজেন্টদের কাছে চন্দন-বাড়ীতে একদিন হুবেলা খাওয়া, একবেলা টিফিন ও রাত্রিবাস,— বাস্‌-বানে একবেলা খাওয়া, একবেলা টিফিন ও রাত্রিবাস,— পক-ভরনীতে একবেলা খাওয়া, একবেলা টিফিন ও রাত্রিবাস এবং ফিরতি পথে পক-ভরনীতে একবেলা খাওয়া,— বাস্‌ যানে একবেলা খাওয়া ও রাত্রিবাসের খরচ ঠিক করে, পুহা টাকটা জমা দিয়ে, রসিদ ও তাঁবুগুলাদের নামে চিঠি নিয়ে নিন। চিঠিটি বেথালেই উল্লিখিত স্থানগুলির তাঁবুগুলার লম্বা-সমেত থাকার এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

অন্তঃপর পথে মাল বইবার কুলি ঠিক করে কেনা-কটার কিছু থাকলে তা'সেরে হোটেল ফিজন। কুলিদের মজুরি এবং বহন-ক্ষমতা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট। কুলিরা কিছু বাড়তি পরসার লোভে বেশি ওজন বইতে চাইলেও কখনই তা' দেবেন না। যেসব জিনিষ (ট্রান্স, হুট্‌কেশ ইত্যাদি) পরলগায়ে রেখে যেতে চান সেগুলি গভর্নমেন্ট, ট্রান্সপোর্ট-এর ক্লক্‌ রুম-এ জমা রেখে আসতে পারেন।— আহারাদি সেসে গুয়ে পড়ুন।

৫ম দিন:

বস্তু সকালে সম্ভব বেরিয়ে পড়ুন চন্দন-বাড়ীর পথে। ন' মাইল যেতে সময় লাগবে হ' ঘটটার মতো। বেলা বারোটা সাড়ে বারোটার মধ্যে যাতে পৌছতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রেখে বেরাবেন।

চন্দন-বাড়ীতে (৯০০ ফিট) বাকি দিনটা ও রাত্রি কাটান।

গ্রাহক হওয়ার

॥ আবেদন পত্র ॥

সম্পাদিকা সন্ন্যাসিনী,
বার্ষিক পরিবর্ধন পত্রিকা,
৮/১/১এফ, বীরপাড়া লেন,
কলিকাতা-৭০০০৩০.

আমি শ্রী/শ্রীমতী.....

..... আপনার

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হ'তে ইচ্ছুক।

এতদ্ব্যন্থে বার্ষিক (সভাক) চাঁদা ৯'০০

(নয় টাকা) মনি অর্ডার নং...../পোস্টাল

অর্ডার নং.....যোগে পাঠান।

সংখ্যা হ'তে পত্রিকা আগার ম্যাট্রিককেট অব

পোস্তি ডাকযোগে নীচের ঠিকানায় পাঠাবেন।

স্বাক্ষর—

ঠিকানা—

• এই পত্রাংশটি কেটে পূরণ করে পাঠাবেন।

লেখকগণ,

পত্রিকার প্রকাশার্থে প্রেরিত রচনার নকল
যেথ পঠায়েন। অমনোনীত রচনা ফেরত
পাওয়ার জন্য উপযুক্ত ডাকটিকেট সঙ্গে যাবেন।

রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে
হওয়া আবশ্যিক। অম্পষ্ট বা দুর্বোধ্য
হস্তাক্ষরের পাণ্ডুলিপি অমনোনীত হওয়ার
সম্ভাবনা অত্যধিক।

লেখকের নাম ও ঠিকানা লেখা অশুষ্ক
কর্তব্য।

আলোক-চিত্র থাকলে গ্রহীতার নাম
দেবেন।

যাত্রিক পরিবহ, পত্রিকা
১৯, রামমোহন মুখার্জি সেন,
হাওড়া-২

এক

৮/১/১-এক, বীরগাড়া সেন,
কলিকাতা-৩০

৩ষ্ঠ দিন :

খুব সকালে বেগ্নিরে পড়ুন। গয়বাসুল—বাহু-
যান। পথ এবার দুর্গম। চন্দন-বাড়ীর অনতিদূরেই
পাবেন পিন্ধু বাড়ির চড়াই।

আবহাওয়া ভাল থাকলে আট ঘণ্টা পৌছবেন
বাহু-যানে। না হলে আরও বেশি সময় লাগবে।
চন্দন-বাড়ী থেকে দূরব আট মাইল। পরে, পিন্ধু
শীর্ষে চারের দোকান পাবেন। কোলপালে আছে
ধারারের দোকান ও তাঁবু। ওখানে একটু বিশ্রাম
নিরে নিতে পারেন।

এদিনই বাহু-যানে আপনাদের তাঁবুতে পৌছনোর
আপে দেখতে পাবেন বিখ্যাত শেখ-নাগ ব্রহ্ম।

রাত্রে থাকুন বাহু-যানে। (১২২০০ ফিট)

৭ম দিন :

ঘণ্টাসত্তর সকালে বেগ্নিরে পড়ুন। এদিন পথের
সবচেয়ে কষ্টকর অংশ মহাশূণ্য শিরিসঙ্কট (কিকিদিবিক
১৪০০০ ফিট) পেরোতে হবে। পক্ষ-তরঙ্গী পর্যন্ত
হাঁটতে সময় লাগবে ন' ঘণ্টা। যাত্রিবাস করুন
পক্ষ-তরঙ্গীতে। (১১০০০ ফিট)

৮ম দিন :

সূর্যোদয়ের আগেই বেগ্নিরে পড়ুন। চার মাইল
হেঁটে পৌছবেন অমরনাথের শুষ্ক-মন্দিরে। দর্শন,
পূজাদি সেবে পক্ষ-তরঙ্গীতে ফিরে, কিজাম ও
আহার করে রওনা হোন বাহু-যান। বেলা একটার
অধো রওনা না হ'তে পারলে পারে হেঁটে সন্ধ্যার
পূর্বে পৌছতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে ঐ আট
মাইলের অল্প যোড়া নেওয়াই সম্ভব। (না হলে
তাঁবুওয়ালার সঙ্গে ব্যক্তি করে সে রাতটা কাটান
পক্ষ-তরঙ্গীতেই।)

সন্ধ্যার বাহু-যানে পৌছে রাত কাটান ওখানে।

যদি যেতে চান

৯ম দিহা :

সকাল সাতটা নাগাত বেরিয়ে একটানা হেঁটে সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাবেন পহলগাঁ।

রাতটা কোনও হোটেল অথবা গভর্নমেন্ট ট্রান্সপোর্ট-এর ডোরমিটরিতে কাটিয়ে দিন।

১০ম দিহা :

সকালে বা যখন ইচ্ছা হয় চলে যান জীনগর। কাশ্মীরের অস্ত্রান্ত দর্শনীয় স্থল সেখাে (চার পাঁচ দিন লাগবে) বরেন বাড়ীর পথ।

। অস্ত্রান্ত ভ্রাতব্য বিষয় ।

(ক) সরকারী বাজার অংশ গ্রহণ না করে নিজেরা জ্বালানী পূর্ণিয়ার আগেই যদি ভ্রমণ করতে চান তো উক্ত তিথির অন্ততঃ আটদিন আগে পহলগাঁ পৌঁছবেন। কারণ, সাতদিন আগে থাকতে অমরনাথের পথ বন্ধ করে দেন সরকারী-বাজার কর্তৃপক্ষ।

(খ) সঙ্গে নেবেন,—

কম্বল দু'খানি। একটি সূতী চাদর, একটি হাওরা-বালিশ কিংবা তুলার বালিশ (এ দুটি পহলগাঁয়ে রেখে যাবেন)। সূতী জামা কাপড় যৎসামান্য। পুরো-হাতা গেঞ্জি একটি; ধাঁরা ট্রাউজার পরেন ওঁরা আওয়ার-ড্রয়ারও নিতে পারেন। পুরো-হাতা সোয়েটার একটি, আধ-হাতা সোয়েটার একটি।

ধাঁরা সরকার পরিচালিত বাজার অঙ্গীভূত হয়ে যাবেন তাঁদেরও পথে হাত্তিবাস ও আহার্যাদির ব্যবস্থা বিশেষেরই করতে হবে।

গ্রহ.স্ হ'জোড়া। ব্যালান্সভা (মস্কি ক্যাপ.) একটি, মস্-লার একটি। পলহী মোজা একজোড়া, নাইলন্ মোজা এক জোড়া। কেড.স্ বা বাটো'র হাক্টার জুতা। জল-নিরোধক টুপি একটি। বর্ষান্তি একটি (হালকা পলিথিনের হলে ভাল হয়)। ঘুখে শূল লাগানো লাঠি একটি (পহলগাঁ থেকে নিতে পারেন অথবা কলকাতা থেকেও নিয়ে যেতে পারেন)। গামছা বা তোয়ালে, গুআটারবটল, টে. লাইট, সিগারেট, লাইটার ও দিয়ারলাই এবং মোরগাতি। ছবি তোলায় লব থাকলে ক্যামেরা, ফিল্ম ইত্যাদি। পুজার সামগ্রী।

এছাড়া কয়েকটি সেকফি-পিন, বিশ পঁচিশ হাত বড়ি,—ভেন্ডলিন্, কোন্ড, ক্রৌম, Avomin ট্যাবলেট, Sloan's Liniment, টিচার আরোজিন্ বা ডেটল্, লিউকোপ্লাস্ট, ফিতা, বোরিক তুলা। হট ওআটার ব্যাগ নিতে পারলে খুব ভাল হয়।

পথে চলতে চলতে বাওরার জন্ত,—কিছু টুকরো করা মিছরি, কিসমিস, ছাড়ানো আখরোট। ত'ড়ো দুধ ও ইন্সট্যান্ট কফি এক জুয়ারা। শুকনো পাওরোট (রাধ্.) এক কিছু পিপার মিশ্ট, লজ্জেল ও ভিটামিন 'সি' ট্যাবলেটও নিতে পারেন।

জিনিসগুলি নিয়ে বাওরার জন্ত মিলিটারির জাক্ বা এঁ জাতীয় ক্যানভাসের থলি নেবেন এক বোকাটি সম্পূর্ণরূপে ঢাকবার জন্ত পরিমিত পলিথিন্ শীট (২০×১২৫০ গেজ) নিয়ে যাবেন।

ভারতের মন্দির

বিশেষ প্রতিবিম্ব
শ্রী শংকরনারায়ণ

[মন্দির ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-জীবনের পরিচয়, পূর্ব-চিন্তার অতিজ্ঞান,—ইতিহাসের উপাঙ্গান।

মন্দিরকে বীর পরম্পরার অধিষ্ঠান-স্থল জানে প্রবল প্রভাব রাজনৈতিক পন্থা উপেক্ষা করেছে ভারতের মাত্র,—মন্দিরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে।

রাজসভাঘরের বিশ্বাসম্পর্কিত অপেক্ষা প্রবাহনকে এখানে অবিবাসীরা দিয়েছে অধিকতর মূল্য, প্রাধান্য ও মর্যাদা। তাই কেবল বার হাজা পেছেন, তাঁর রাজপ্রাসাদ, রাজধানী বার হাজাও লুপ্ত হয়ে গেছে,—চূর্ণের রাজনৈতিক নিষ্কর হতে গেছে কাদমতে,—রাজবাহ চক্রবর্তী নাম শুনিতে গেছে বিশ্বস্তির অতল তলে তাঁরই সঙ্গে। কিন্তু যদি সেই রাজ্যের স্তম্ভ শেখার থাকে তাহলে তাঁর নামের এখনও লক্ষ্যমি পড়েনি। অনুমানারূপ বাহিরে রেখেছেন তাঁর রচিত মন্দিরটিকে মূল-মূল্য বর, আর তাঁরই কলে বেঁচে আছে রাজ্যের স্থিতি, রাজ্যের নাম। মন্দির দিয়েছে তাঁর স্থিতিতে অবতরণ।]

। ১৭ ।

মধ্যপ্রদেশের বীণা থেকে মাইল আট দূরে এরন। ওখানে ঠেঁটে বাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।

বীণা রেল স্টেশন থেকে রেল লাইন বরে বন্ধিগে কিছুদূর গেলেই বীণা নদী। তার উপরের রেল ব্রিজ পেরিয়ে, মাইল চার গেলে করওয়ান—কেথোরা রেল স্টেশন। স্টেশনটির উত্তর কেবিন-এর গা দিয়ে মাঠে নেমে বাওয়া পথটি বরে কিছুটা গেলেই একটি

গ্রাম। গ্রামটি একটি টিলার অবস্থিত। অদূরে বইছে বীণা নদী। নদীর জলোচ্ছ্বাসে যাতে ঘর-বাড়ী না ভুবে যায় তাই গ্রামটি স্থাপিত হয়েছে উঁচু টিলার। ওখান থেকে দেড় মাইল দূরে আর একটি গ্রাম একে সেখান থেকে দু' মাইল গেলে এরন। গ্রামে চোকার মূখ্য আসোচ্য মন্দিরটি। অসংখ্য গুপ্ত-মন্দিরটির গুরুত্বের কারণ, এটি এবাংগ আবিষ্কৃত গুপ্ত-মূণের মন্দিরগুলির অস্তিত্ব।

এরন ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষ অবদান

জুগিয়েছে। এখানেই ভারতবর্ষের একমাত্র ডাইনে থেকে বাঁয়ে বিস্তৃত বরোঙ্গী লিপির মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে।

উদ্বুদ্ধ এক প্রাঙ্গণের দেবালয়টির বিধ্বস্ত নানা অংশ ছড়িয়ে আছে। মন্দিরের অঙ্গনে রয়েছে দুটি স্তম্ভ, যার মধ্যে বড়টি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। স্তম্ভটির



শীর্ষভাগে গুরুত্ব মূর্তি; নীচে ভিত্তির কাছাকাছি সিংহের প্রতিকৃতি। কাছেই তারের বেড়ার গায়ে পড়ে আছে অনন্ত-ময়ানের ভাঙা মূর্তি,—এক শাল-স্তম্ভিকার ভগ্ন উর্বাংশ এবং কিছু মূর্তি। ছোট স্তম্ভটি একটি বিহঙ্গের মূর্তি লাক্ষিত এবং ছায়াপাতি চতুর্ভুজ বিশিষ্ট এক আয়তক্ষেত্র সমন্বিত। স্তম্ভের অঙ্গে লিখর হাতে প্রলঙ্ঘিত ঘণ্টার প্রতিকৃতি। (বজ্রাহার ঘণ্টাই মন্দিরে সম্ভবতঃ এরই অঙ্গকরণে প্রলঙ্ঘিত ঘণ্টার ব্যবহার করা হয়েছে।)

স্তম্ভের সম্মুখে, অর্থাৎ পশ্চিমে এক নৃসিংহ মূর্তির আনক ভগ্নাবশেষ। তার উত্তরে মন্দিরের মণ্ডপের ধ্বংসাবশেষ। অঙ্গনে চারটি স্তম্ভ রয়েছে। ঐগুলিতে গুপ্ত-কালীন পূর্ণকৃষ্ণের প্রতিকৃতি।

মন্দিরের অগভীরে সিংহ, গজ, মহুগ, কুম্ভাকার শায়িত-বিহু প্রকৃতি মূর্তির অলঙ্কার।

ধামগুলির পশ্চিমে, পূর্বঘারী মন্দির। লাল

অভ্যুদয়ের তিশোর সাহিত্য

বিমল বসন্তের	
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প	২'০০
বিকৃতিকুল্লণ বন্যোপাখ্যারের	
ভৌতিক গল্প	১২'০০
বোধিসত্ত্বের	
কঙ্কাল উপকূল	৩'৫০
মমোরঙ্গন বোনের	
প্রত্যাবর্তন	৩'৫০

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির

৬ বক্সিস চারুকলা স্ট্রীট

কলকাতা-১২

পাথরের দেবালয়টির গর্ভগৃহের দ্বারের সামান্য অংশ মাত্র দাঁড়িয়ে আছে। বিধ্বস্ত গর্ভগৃহের বৌদ্ধে নগ্নায়মান বিশাল বিহু। নিম্ন বাম বাহুর কটিপ ভঙ্গিমায় রক্ষিত। অপর বাহু তিনটি ভগ্ন। তবে, নিম্ন দক্ষিণ বাহুর মূর্তি বর্তমান। ঐ অংশে মাল্য বৃত্ত। মূর্তির ক্রীট লক্ষ্যণীয়।

মন্দিরের দক্ষিণদিকে এক বিরাট বরাহ মূর্তি মহুগের মতো চতুর্ভুজ কৃমিতে স্থাপিত করে নগ্নায়মান। মুখটি ক্ষুদ্রিত। (এই বহনের বরাহ মূর্তি আছে বজ্রাহরে।) বরাহের অঙ্গে অঙ্গল কৃত্ত মূর্তি। কণ্ঠে লিপি।

মন্দিরের প্রবেশ পথের দুপাশে বহু মূর্তির অলঙ্কার। বাঁ-হাতি একটি নারী মূর্তির মাথায় ছত্র-বারিধী অপর এক নারী শোভা পাচ্ছে। বরাহের বেলতলে, কৃমিতে, কদম্প্রাপ পঙ্ক-নাগের প্রতিকৃতি। ডের, ও বনবাসী এবং অমরাবতীর চৈত্রে আছে অলঙ্কার পঙ্ক-নাগ।

কাকীর দেবী-পীঠ

শ্রী কামল বন্দ্যোপাধ্যায়

মাস্তাঙ্গ থেকে পঁচাত্তর কিলোমিটার দূরে কাকীপুরম্। রাণওয়ার বাজার স্ট্যাণ্ড থেকে সকাল সাড়ে সাতটার ছাড়লো বাস। পনরো মিনিট অস্থির বাস আছে কাকীপুরম্ বাণ্ডার। সময় লাগে ছ'ঘণ্টা।

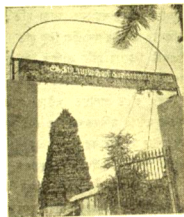
আমাদের বাসটা প্রথম বামলো মীনম্-বাক্কম্-এ। তারপর ডাম্‌ওয়ারম্ এক আধিনপেট্ট হয়ে সোজা কাকীতে গিয়ে পৌঁছলো ঠিক সাড়ে ন'টার।

এর আগেও গেছি কাকীতে। নিক-কাকী ও কিকু-কাকীর সব কটি স্ট্রবাই দেখা আছে। তবু আর একবার দেখে বাই ভেবে এবারের এই যাত্রা। অবশ্য তার মধ্যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও আছে। তা' হলো কাকীর দেবী-পীঠটি ভাল করে দেখা।

আনি সঠিক তীর্থ-যাত্রীও নই, সেবারাধনার বাসনা নিয়েও আসিনি। তাই দেবীর মন্দিরে বাণ্ডার আগেই ঢুক পড়লাম একটা কাকুকেতে। ছ'বানা বেত, তু বৈড় ও এক গ্রাস ককি উন্নরছ করে কিলাম। তারপর মিনিট পাঁচ হেঁটে পৌঁছলাম কাকীর বিখ্যাত কামাকীরদেবীর আলয়ে।

মন্দিরটির চারটি গোপুরম্। কিন্তু মাত্র

মন্দিরটির মধ্য দিয়ে বাণ্ডা-আশার পথটিই ব্যবহৃত হয়। ঐ গোপুরম্টির বাইরে দিয়ে ডান-হাতি মন্দির ঘেঁবে চলে বাণ্ডা পথটি ধরে চলতে চলতে এলো তৃতীয় গোপুরম্টি। তার পা দিয়ে বেরিয়ে গেছে আর একটি পথ। ঐ পথে সামান্য এগিয়ে বাঁ-হাতি দুরতেই চোখে পড়লো আদি-পীঠ



পরমেশ্বরীর মন্দির। নক্ষত্রের সতী আশ্বকিনর্জন দিলে শোকোদ্ভক্ত মহাদেব তাঁর শব স্বস্তে বিচরণ করতে থাকেন। বিকু-চক্রে সেই শব বণ্ডিত হয়ে

একাল ভাপে ভারতের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হয়। কাঞ্চীতে পড়েছিল কঙ্কাল এবং ভারত স্বরূপে এই আদি-পীঠ পরমেশ্বরী দেবস্থানের উৎপত্তি।

মন্দিরটি কামাক্ষী মন্দিরের তুলনায় খুবই ছোট কিন্তু হুপ্রাচীন। গোপুরনের অলঙ্করণ দেখলেই তা' প্রতিভাত হয়। বয়স অনুমান আটশ' বছর। গর্ভগৃহের সম্মুখস্থ দ্বারপাল দুটির গঠন আকস্মিক সকল দেবালয়স্থিত দ্বারপাল হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক। গর্ভগৃহে অধ-পদ্মাসনাসীনা দেবী মূর্তি বিরাজ করছেন।

দেবী চতুর্ভুজা,—ঊর্ধ্ব হস্তে পাশ, নিম্নে কপাল, বক্ষিণ ঊর্ধ্ব হস্তে অঙ্কুশ এবং নিম্নে অস্ত্র-মুদ্রা ধারিণী। দেবীর পূরোভাগে ভূমিতে গৌরীপট্টাকার একটি আধারে স্ত্রী-স্বয়ং আছে।

পীঠস্থান মাঝেই দেবীর ভৈরব থাকেন। এই দেবীর ভৈরব কোথায় তা' বলা সম্ভব নয়। মন্দিরে শিবের কোনও কক্ষ নেই বা সংলগ্ন কোন মন্দিরও নেই। অদূরে অবস্থ একটি পতিত শিব মন্দির আছে।

দেবীর কক্ষের বাইরে একটি ক্ষুদ্রাকার শিব-লিঙ্গ বিস্তারিত বা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। গৌরীপট্ট বিশিষ্ট ঐ লিঙ্গে দেবীর মূর্তি ক্ষোদিত। মন্দিরের এক পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করার বললেন,—এই লিঙ্গের নাম শক্তি-লিঙ্গ। আখ্যাত অর্থবহ মনে হলো না। লিঙ্গ মূর্তির বেছে কেন দেবীর মূর্তি ক্ষোদিত?—উনি যে দেবীরই অর্ধাঙ্গ-স্বয়ং এই কথাটিই বোঝাবার ক্ষমতা কি? আমার ধারণায় অবশ্যই তাই।

দেবীর কক্ষের ডান-হাতি কক্ষটিতে পঞ্চ-লোহ নির্মিত কামাক্ষী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী অধিষ্ঠিতা।

[ভারতীয় রেজিস্ট্রেশন্স অফ প্রেস
অ্যান্ড
বুক্‌স্‌ অ্যান্ড, অল্পব্যয়ী বোম্বা]

- ১। প্রতিকার নাম : বাহ্যিক পরিবর্তন প্রতিকার।
যে ভাষায় প্রকাশিত : বাংলা।
- ২। প্রকাশকাল : বার্ষিক।
- ৩। প্রকাশকের নাম : শ্রীমতী শুভা বসু।
ঠিকানা : ৮/১১-এক, বীরশাড়া সেন,
কলিকাতা-১০০০৩০।
জাতীয়তা : ভারতীয়।
- ৪। মুদ্রাকরের নাম : শ্রীমতী শুভা বসু।
ঠিকানা : ৮/১১-এক, বীরশাড়া সেন,
কলিকাতা-১০০০৩০।
- ৫। ব্যবসায়িকার নাম : শ্রীমতী শুভা বসু।
ঠিকানা : ৮/১১-এক, বীরশাড়া সেন,
কলিকাতা-১০০০৩০।
জাতীয়তা : ভারতীয়।
- ৬। সম্পাদকের নাম : শ্রীমতী শুভা বসু।
ঠিকানা : ৮/১১-এক, বীরশাড়া সেন,
কলিকাতা-১০০০৩০।
জাতীয়তা : ভারতীয়।

আমি, শুভা বসু, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি
যে, উপরি উক্ত বিবরণী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস
অনুযায়ী সত্য।

শুভা বসু
১০-৮-১৬

মন্দিরের গোপূৰ্ণ দিয়ে মণ্ডপে প্রবেশের মুখেই আছে আর একটি অতীব কৌতূহলকর চিত্র। ডান-হাতি একটি প্রস্তর কলকে উৎকীর্ণ আছে উট ও তাদের চালক সহ তিন ব্যক্তির চিত্র। নিম্নেই তাঁরা বহিরাগত এক রাজস্থান বা গুজরাট অঞ্চলের মানুষ। রাজস্থানী মেরজাই ও টুপি সূচিত। মনে হয় দেবার অঞ্চলের বা গুজরাটের কোনও রাজ-কন্যার এই মন্দির পরিদর্শনের আরও হিসাবে প্রস্তর আলংকারি রচিত। ফলকটি যে মন্দিরের মূল গাথনি থেকে পৃথক্ তা' বেশ বোকা যায়।

কাকীতে রাজ্য করতেন স্থানীয় পল্লব রাজবংশ। তাঁদের রাজ্যভূক্ত একাধিক মন্দিরে উটের চিত্র বিদ্যমান। পক্ষীতীরের সুরগুরু মন্দিরেও দেখা যায় উটের প্রতিকৃতি।

এই দেবীপীঠ সম্বন্ধে তদ্র-চূড়ামণিতে উক্ত হয়েছে—

কাকীমেশে চ কংকালো ভৈরবো রুচ নামকঃ।

দেবতা দেবসর্গাখা

অর্থাৎ, কাকীদেশে কঙ্কাল (পতিত হয়েছিল), তদ্রু ভৈরবের নাম রুচ এবং দেবতা (পীঠাধিবাসী) দেবসর্গা।

কাকীর মুখ্য দেবতা স্বরভূ-লিঙ্গ একাত্ত্রেশ্বর। ইনি দক্ষিণাংশের স্বরভূ-লিঙ্গ পঞ্চকের অন্ততম,— কিত্তি-লিঙ্গ। তাঁর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বিধায় কাকীর অপর নাম,—একাত্ত্রেশ্বর ক্ষেত্র বা একাত্ত্রক্ষেত্র। দেবী ভাগবতে পীঠ বর্ণনে বর্ণিত হয়েছে—

একাত্ত্রপীঠে সম্ভ্রান্তা দেবী সা কীৰ্ত্তিমতাপি।
অর্থাৎ, একাত্ত্রপীঠে সেই দেবী কীৰ্ত্তিমতী নামে উক্ত।
মৎস্যপু্রাণে দেবীর অষ্টোত্তরশত নামাকলীতে প্রকাশ,—

একাত্ত্র (৩২)-কে কীৰ্ত্তিমতী।

তিনি একাত্ত্রকে কীৰ্ত্তিমতী।

কৃত্তবামল তন্ত্রে ব্যক্ত হয়েছে,—

কটায় কাকীঃ বিনির্দিশেৎ।

অর্থাৎ, (দেবীর) কটিদেশে নির্দিষ্ট হয়েছে কাকী।
কাকীপুরমের প্রান্তন নাম কামকোট্টম্ এবং কামাকী দেবীর স্থানীয় নাম কাম-কন্বি। দেবী এখানে শিবের কামনায়া উপায়ত্যা হয়েছিলেন। শিব-কারী সেই কস্তার নাম হয়েছিল, কাম-কন্বি। কাম-কন্বির স্থান তাই,—কামকোট্টম্। বৃহদ্রীলতন্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে,—

ত্রৈপুণ্য কামকোট্টক।

ললিতা ত্রিশতীতেও এই কামকোট্টম্ দেবীর উল্লেখ দেখা যায়—

কামকোট্টি নিলয়াই

ময়টিতে! বৃহদ্রীলতন্ত্রের অন্যত্র এক প্রোকাণ্ডে উক্ত হয়েছে—

কাক্যাঃ কনক কাকী স্তাদ্।

কাকীর বিশেষ সুপরিচিত বিত্তীয় বা নতুন মন্দিরটিতে। অষ্টাদশ শৃঙ্গোদ পর্বত দেবীর একটি স্বর্ণমুৰ্ত্তি বিরাজমানা ছিলেন। বর্তমানে মূৰ্ত্তি তৎপ্ৰাচ্যবৃ-এ স্থানান্তরিত।

জোড় কথা

একলব্য

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

॥ ভিন্ন ॥

বোমকা'র মুখে চাঁদাই ও টুনটুন শুনেছিল
বোবিসবের লিহে জন্মের গল্প।

সেদিন তাঁকে কাছে পেয়েই টুনটুন হয়ে বসলো
: বোমকা' আজ বোবিসবের এমন একটা গল্প বলুন
যাতে তিনি মাছ না হয়ে অস্ত্র কিছু হয়েছিলেন।

: উঃ, তোমের কি সব অপক্লপ প্রস্তাব বাবা!
—বলে চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলেন
বোমকা'। বোধহয় ভাবতে লাগলেন একটা
গল্প। আর তা মনে আসতেই বললেন : শোন—

বারাণসীতে যখন ব্রহ্মরথ রাজা ছিলেন সেই
সময়ে, বোবিসব হিমালয়ের কাছাকাছি এক অঞ্চলে
শাখাম্বুগ হয়ে জন্মেছিলেন।

: শাখাম্বুগ কি বোমকা' ? টুনটুন জানতে
চাইলো।

: আমি জানি। চাঁদাই বলে উঠলো।

: বলো না দেখি। টুনটুন আহ্বান
জানালো।

: বলে দি বোমকা' ? — চাঁদাই বোমকা'র
অহুমতি চাইলো।

: হ্যাঁ বল।

: শাখাম্বুগ মানে, বানর।

বোমকা' বললেন : ঠিক বলেছি। শোন
তারপর।

তিনি একটু একটু করে বড় হলেন এবং জ্ঞেয়ান
ও শক্তিমান হয়ে উঠলেন। ঐ অঞ্চলের বানরদের
মধ্যে তাঁর মতো বিশালমোহী ও ক্ষমতাবান অস্ত্র কেউ
না থাকায় কয়েক হাজার বানরের তিনিই হলেন
নেতা।

: নেতা মানে কি রে টুনটুন ? কাকে নেতা
বলে জানিস ?

টুনটুন চুই করে উত্তর দিলো : হ্যাঁ জানি।
বক্তৃতা দেখ।

ওর কথার হেসে ফেললেন বোমকা'।

টুনটুন বৃকতে পায়েলোনা উত্তরটা ঠিক হলো,
না ভুল হলো। ভয়ে ভয়ে বিজ্ঞেস করলো : তবে
নেতা মানে কি ?

যোমকাকা বললেন : গল্পটা শোন। তাহলে
নিজেই বুঝে যাবি নেভা কাঁকে বলে।

বোবিসক-আবাত্ত যখনে থাকতেন তার
কাছেই, গল্পার তীরে, ছিল বিরাট এক আমগাছ।
গাছটা এত উঁচু যে, মনে হতো তার মাথাটা
আকাশে ঢুক গেছে। তার ফলের ছিল এমনই
মধুর স্বাদ যা বলে বোকানো যায় না।

গাছটি নদীর কিনারায় থাকায় তার একটি
ডালের আম জলে পড়তো এবং আর একটির
পড়তো স্থলে,—একটু দূরে। বাকি দুটির ফল পড়তো
গাছের গোড়ায়। আম পাকলে, বোবিসক ও তাঁর
সঙ্গী বানররা গাছটির সমস্ত আমই খেতেন। তার
আগে সাবধানতার জন্ত তিনি একটি কাক করতেন।
যে ডালটির আম জলে পড়ে যেতো তাতে বউল
ধরলেই, বোবিসক সঙ্গীদের দিয়ে তার সমস্ত বউল
ছিঁড়িয়ে ফেলতেন। যাতে একটিও আম বড় হয়ে
পেকে নদীর জলে না পড়ে এক ভাসতে ভাসতে
অন্ত কোথাও গিয়ে বিপদ ডেকে না আনে। বাকি
ভিনটি ডালের আম বড় হয়ে পাকলে তিনি ও তাঁর
সঙ্গীরা সেগুলি খেতেন।

অত সতর্কতা সত্ত্বেও একবার জলের ওপরের
ডালটার পিঁপড়ের তৈরি পরপুটের নথো একটা
আম হয়ে গেলো।

পরপুট মানে কি তা তোরা বোধহয় জানিস
না?

ঘাড় নেড়ে ঠান্ডাই ও টুনটুন জানালো, তারা
জানে না।

: পরপুট মানে গাছের পাতার পাতার
মিলে পড়ে গুঁটা গুঁটা। ঐ রকম এক গুঁটার
ভিতরে লুকোনো থেকে আমটি বড় হয়ে উঠলো ও

শেষপর্ঘন্ত পেকে একদিন নদীর জলে টুপ করে য়ে
পড়লো। তারপর ভাসতে ভাসতে, বহু দূরে গিয়ে
গঙ্গার এক জায়গায় বাঁধা একটা জালে
আটকে গেলো।

বাগানসীর রাজা গঙ্গার জলে হু-জারগার
পাঁচিলের মতো করে জাল বাট্টিয়ে, হু-জালের
মাঝবানের জলে, ওই সময়ে গরমের জ্বালায় সীতার
কাটছিলেন। সন্নিহিত বয়ে সারাদিনই স্থান ও
সীতার চলছিল।

সেদিন বিকেলে রাজার লোকরা জাল ডুলে
এনে দেখতে পেলো জালে আটকে আছে হুম্বর
টুসটুসে পাকা, মনমাতানো গন্ধে ভরা একটি ফল।
তারা ওরকম ফল আগে কখনও দেখেনি। ফলটা
যে কি হতে পারে তা বুঝতে না পেরে তারা সেটি
নিরে রাজাকে দিলো।

রাজাও এর আগে ওই ফল দেখেন নি। তিনি
ফলটি নিয়ে তাঁর সঙ্গের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করলেন
যদি কেউ জানে, শুটা কি ফল। কেউই কিছু
বলতে পারলো না।

শুধন ডাক পড়লো বনচরদের অর্থাৎ হারা বনে
বনে ফল ও কাঠ কুড়িয়ে বেড়ায় তাদের।

তারা এসে ফলটি পরীক্ষা করে বললো,—একে
বলে আমকল। এ ফল মাছের বাস্ত।

রাজা ফলটি কাটিয়ে একজন বনচরকে প্রথমে
বাওয়ালেন। পরে নিজে একটুকরো খেলেন, বাকীকে
বাওয়ালেন আর দিলেন ময়ূকে।

সকলেই স্বাদে গন্ধে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

রাজা বনচরদের জিজ্ঞেস করলেন,—কোথায়
এই ফলের গাছ আছে?

তারা জানালো,—এখান থেকে অনেক দূরে,

জাতক কথা

হিমালয়ের কাছাকাছি পাহার তীরে রয়েছে এই ফলের গাছ।

রাজা তবনি রাণীকে নিয়ে মন্থপথী ছুটিয়ে দিলেন সেই আমগাছের উদ্দেশে। সঙ্গে চললেন মন্ত্রী, শ'বানেক নৌকা বোকাই গ্রহরী, দাস-দাসী ও দৈত্য সামন্ত। বনচররা চললো পথ দেখিয়ে।

ক্রোধের পর ক্রোধ নৌকা ধেরে তাঁরা এক জাহ্নগায় পৌছালে বনচররা বললো,—মহারাজ, ঐ দেখুন সেই গাছ, দার কল আপনি খেতেছেন।

রাজা আদেশ দিলেন,—ওই গাছের কাছে নৌকা থামাও।

নৌকাগুলো ডাঙায় ভিড়লে সবাই উঠে গাছটির আশপাশে তাঁবু ফেললেন।

বিকল হয়ে গিয়েছিল, রাজা তাই তাড়াতাড়ি আম পাড়তে বললেন।

গ্রন্থর আম পাড়া হলো। রাজা, রানী ও তাঁদের লোকজন পেট ভরে মিষ্টি রসাল ফল খেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে, খুশী মনে, সন্ধ্যা হতেই শুয়ে পড়লেন।

চারদিকে জ্বলতে লাগলো মশাল, গ্রহরীরা পাহারা দিতে লাগলো।

রাতের অন্ধকার বাড়তেই বোধিসত্ত্ব-শাখামৃগ তাঁর বলকল নিয়ে এসে আম খেতে শুরু করলেন।

হাজার হাজার বানরের দাপাদাপিতে রাজার ঘুম গেলো ভেঙে। তিনি উঠে বানর-বলকে দেখতে গেলে তাঁর লোকজনের ডেকে তুললেন ও সৈন্যদের বললেন,—আমথেকো এই বানরদের ঘিরে ফেলো যাতে একটাও না পালাতে পারে। দিনের আলো ফুটলেই এদের ঘেরে ফেলাতে হবে।

সৈন্যরা রাজার কথামতো বহুকে তাঁর লাগিয়ে,

Insulation & Refractories (India)

1/2, 1/3, Chetla Road,
Calcutta-53

★

Manufacturers of :

Asbestos Magnesia Compound—85%

Asbestos Insulation Plates &

Pipes (H D—59)

and

Asbestos based insulation items

of all descriptions

গাছের তিন পাশ ঘিরে ফেললো। মাত্র তিন দিক তারা ঘিরতে পারলো, কারণ চতুর্থ দিকটিতে ছিল নদীর জল।

রাজার সৈন্যদের হাতে তাঁর বহুক দেখে নিজেদের হত্যা অব্যাহিত জেনে বানরের বল মরণ ভয়ে কাপতে কাপতে বোধিসত্ত্বকে বললো,—গ্রন্থ এখন কি হবে।

দলনেতা বোধিসত্ত্বের যে ভয়ঙ্কর শক্তি ছিল তাতে তিনি অতি সহজেই লাক ঘেরে গঙ্গা পেরিয়ে পালাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। দলের সকলকে ও বিশেষ করে দুর্বল বানরদের অভয় দিয়ে বললেন,—তোমরা কিছু ভেবো না। আমি যতক্ষণ আছি ভয় কোরো না। আমি তোমাদের নেতা,—যদি কেউ মরে তো আমিই প্রথম জেনো।

এই বলে তিনি গাছের যে ডালটি নদীর জলের ওপরে গিয়ে পড়েছিল তাঁতে চড়ে বেশ কিছুটা

এসিরে সেলেন ও প্রাচণ্ড এক লাফ দিয়ে চারশো হাত জল পেরিয়ে নদীর অপর পাড়ে গিয়ে পড়লেন। সেখানে এগার থেকে তীর ছুঁলে পৌঁছন না।

যেখানে তিনি পড়লেন তার কাছেই ছিল বড় বড় বেত গাছের জঙ্গল। বোবিসব খুব লম্বা করে কটা বেতগাছ নিয়ে, ছাল ছাড়িয়ে সেগুলো নিয়ে একটা দড়ি তৈরি করে ফেললেন। গঙ্গার ওপারের আমগাছের যে ডালটা থেকে তিনি লাফ দিয়েছিলেন তার দূরত্বটা বুঝে নিয়ে দড়িটা সেখান পর্যন্ত পৌঁছানোর মতো লম্বা হয়েছিল কিনা দেখে নিলেন। তারপর সেইবেতের দড়ির একটা খুঁট, মন্ত এক গাছের খুব উঁচু ডালে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে আমগাছে ভিরাবার জন্ত তৈরি হলেন। তাঁর কৌশলটা হলো এই যে, গাছের মাঝের বাঁধা দড়িটার অস্ত খুঁটটা ওপারে নিয়ে গিয়ে সেই আমগাছের মাঝার বেঁধে নিলে, জলের ওপর দিয়ে খাটানো দড়িটা ধরে কুলতে কুলতে, গঙ্গার জল পেরিয়ে সব বানরই অন্ধকার কাটার আগে পালাতে পারবে।

বোবিসব লাফ নিলেন।

কিন্তু হায়! তাঁর হিসাবে ভুল হয়েছিল। দড়িটা গাছের কাছ পর্যন্ত পৌঁছলো বটে, কিন্তু গাছ ছুঁলো না। বোবিসব গাছের একটা ডাল ধরে ফেললেন ও কুলতে লাগলেন। তাঁর কোমরে বাঁধা দড়িটা খুব টান হয়ে ওপার পর্যন্ত যেন দড়ির একটা শাঁকো তৈরি হলো।

সেই লম্বা হয়ে কোলা অবস্থার তিনি চীৎকার করে তাঁর দলের বানরদের বললেন,—তোমরা যত শিগগির পারো আমার দেহের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নিয়ে এই দড়ি ধরে ওপারে পালিয়ে যাও।

বাঁচার আনন্দে, মুক্তির আশায়, সেই কয়েক

হাজার বানর বোবিসবকে মাড়িয়ে গিয়ে দড়ির সাহায্যে নদীর অপর পাড়ে চলে গেলো।

সবশেষে যে বানরটা গেলো সে ছিল বোবিসবের পণ্ডেই দলের সবচেয়ে শক্তিশালী বানর। মনেমনে সে বোবিসবকে দারুণ হিংসা করতো ও বোবিসবের মৃত্যু হলে নিজেকে নেতা হবে ভাবতো।

সে দেখলো, একটা জালো স্রবোণ এসেছে। কেউ কিছু বুঝতে পারবে না অথচ বোবিসবকে শেষ করে যেওয়া হবে, এই ভেবে সে বোবিসবের দেহের ওপর দিয়ে ঘাওয়ার সময় এক জোরে পা দিয়ে আঘাত করে গেলো যে, তাঁর ক্‌স্‌ক্‌স্‌ কেটে গেলো। মুখ দিয়ে তাঁর রক্ত ঝেরোতে লাগলো। ঘরনার ছটফট করতে করতে ও তিনি কিন্তু একই ভাবে পাছের ডাল ধরে কুলতে লাগলেন।

বারাণসী-রাজ ভেগে শুয়েছিলেন। তিনি বোবিসব ও তাঁর দলের বানরদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ দেখলেন ও মনেমনে কলতে লাগলেন,—কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার! এই বানর-নেতা নিজের জীবন হুমকি করে নিজের অহুত্বের বাঁচালেন! মাহু-নেতার চেয়ে মধৎ এই বানর-নেতা। এঁর প্রাণ হরণ করলে অপরাধ হবে।

রাত শেষ হলো।

রাজা তাঁর সৈন্যদের আদেশ দিলেন,—যে একটিমাত্র বিরাট বানর গাছের ডালে কুলে আছে তাকে তোমরা যেয়ো না।

বেলা বাড়লে তিনি তাঁর লোকজনদের দিয়ে মন্ত উঁচু এক মক তৈরি করিয়ে রক্তাক্ত শরীর বানর-নেতাকে তার ওপরে নামিয়ে আনালেন। বৈজ্ঞানিক ডেকে তাঁকে অনেক রকম গুণে বাতরালেন এক গজাঝলে স্থান করালেন। রাজার আদেশে

শারদ সংখ্যা—১৩৮৩

[পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাটিই শারদ সংখ্যা]

॥ বিষয় সূচী ॥

ভ্রমণ কাহিনী :

তিনটি সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী

পথ-নির্দেশ :

ভারতের

উত্তর, দক্ষিণ, এবং

মধ্যাঞ্চলে বেড়াতে

যাওয়ার বিশদ পথ-নির্দেশ

মনে পড়ে :

কয়েকটি

বিচিত্র আখ্যান

কিশোরদের জন্য :

একটি ভ্রমণ কাহিনী

রমা-রচনা :

পাষণ-কবিতা

[একটি বিখ্যাত মন্দিরের কথা]

জিজ্ঞাসা

এক

বহু সংখ্যক আলোক-চিত্র

মূল্য ৫.০০

ভাত ঘাতল স্বতন্ত্র

পূজার তিন সপ্তাহ পূর্বে প্রকাশিত হবে

একটি সুন্দর নরম বিছানা করে বোবিসব শাখামুগকে ধীরে ধীরে নামিয়ে তাতে শোয়ানো হলো।

রাজা বানর-নেতার কাছে গিয়ে তাঁর শরীরের যত্নশা কমছে কি না জ্ঞানতে চাইলেন ও বললেন,—আমি কাল রাতে ঘচকে আপনার সব কাজ দেখেছি। নিজের জীবনের মাস্তা না করে আপনি যেভাবে অন্যান্যদের জীবন রক্ষা করলেন তা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমার বড় কৌতূহল হচ্ছে আপনি কে তা জ্ঞানতে।

যত্নশা কাতরাতে কাতরাতে বানর-নেতা বোবিসব বললেন,—আমি বানরদের নেতা। ওরা আমার সব কথাই মেনে চলে। সব কিছুতেই ওরা আমাকে প্রথম অবিকার দেয়। তাই ওদের সামনে যখন দৃষ্ট দেখা দিলো তখন আমিই প্রথম এগিয়ে সেলাম। নেতার যা উচিত সেই কাজটুকুই আমি করেছি।

রাজা বললেন,—অপূর্ব!

বোবিসব তারপর তাঁর জ্ঞানাসুরের পরিচয় দিলেন ও রাজাকে নানা উপদেশ দিতে দিতে প্রাণত্যাগ করলেন।

রাজা প্রহরীদের ডেকে বললেন,—এই মহান নেতার অস্বাভাবিকতার অন্বেষণ কর। রাজা মহারাজার জন্য যেমন ব্যবস্থা হয় ঠিক তেমনি ব্যবস্থা করবে।

তখন অশুর, চন্দন, ঘি, মূল ও কাঠ দিয়ে মহা সমারোহে বোবিসব-শাখামুগের মৃতদেহ দাহ করা হলো।

তাঁর চিত্তাভ্রম একটি সোনার পেটিকায় রেখে তার ওপরে বিশাল এক স্মৃতিসূপ নির্মাণ করিয়ে দিলেন বারানসী-রাজ।

গল্প শেষ করে ব্যোমকাকা বললেন : কিরে টুন টুন, এবার বুকে পায়লি নেতা কাকে বলে ? চাঁদাই, পেরেছিল ?

: হুঁ। —টুন টুন ও চাঁদাই একসঙ্গে জানালো পেরেছে তারা।

: তোরা বড় হয়ে যখন সঁচী বাবি, তখন সেখানের বৌদ্ধ-ভূপে বোবিসবের এই কাহিনীটি বোঁদাই করা রয়েছে দেখতে পাবি। এখন এই ছবিটা দেখে রাখ। —বলে ব্যোমকাকা তাঁর পকেট থেকে একটা ফোটোগ্রাফ বের করে দেখালেন।

একাত্তরের চিঠি

সবির নিবেদন,

চৈত্রমাস থেকে লিখছি। আজ ৩রা জুলাই,
শনিবার, ১৯৭৬ সাল।

তিনশ' বছর আগে যদি কেউ বলতেন পকাশ
মাইল দূর থেকে একজনের কণ্ঠস্বর তিনি শুনে
পান বা পারেন তাহলে তাঁকে কুণ্ঠিত হতে হতো।
মিথ্যাবাদী বা পাপল আখ্যায়। দেশ বিশেষে হয়তো
তাঁকে শ্রোতাঘিট বলে পিটিয়ে হত্যা করা হতো।

কিন্তু আজ?—পাঁচ হাজার মাইল দূরে
আমেরিকার রাষ্ট্র-প্রধান কি বক্তৃতা দিচ্ছেন তা'
আমরা শুনে পাই। পাইনা কি?—আজ আমরা
উপরোক্ত পকাশ মাইল দূরের কথা শুনে পাওয়ার
অবিস্বাসী নই।

কিন্তু যদি কলা যায় পাথরের মূর্তি জীবন্ত হয়ে
ওঠে, তা'হলে?

অবশ্যই তা'হলে নিবারণ উপহাসের পাথ
হ'তে হ'বে।

আজ যদি বস্তু-বিজ্ঞান তার ক্রমবিকাশের পথে
পাঁচ হাজার মাইল দূরে বাক্যালাপ শোনার ক্ষমতা
আমাদের দিতে পারে তা'হলে প্রাচীনকালে অধ্যাত্ম-
বিজ্ঞানের শক্তি বা মানুষের মধ্যের ঐশ্বরিক সখা বা
ক্ষমতা পাথরের মূর্তিকে জাগ্রত, জীবন্ত করতে
পারতো এ উক্তি কি একেবারেই গ্রহণযোগ্য হ'তে
পারে না?—

আমাদের কালে তা' বিবাসযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য
হোক কিংবা না হোক, এক দোঁপ-প্রতাপ মূর্তির
রাজত্বকালে পাষণ মূর্তির সজীব হওয়ার ঘটনা
আলোড়িত করেছিল তাঁর সমগ্র রাজ্যকে। দাঁক-
তথা সমগ্র ভারতের ঐতিহ্যগে বিশ্বদ্রবর গৌরবের
অধিকারী সেই মূর্তির নাম শিবপদমেশ্বর রাজরাজ
চোড় (১ম)। ভারতবর্ষের সীমারেখা ছাড়িয়ে পূর্ব-
ভারতীয় খীপপুঞ্জ পর্যন্ত তিনি প্রসারিত করেছিলেন
স্বীয় প্রতাপ। এক কথায়, তাঁর রাজত্ব বাঘে-গরুতে
একই ঘাটে জল পান করতো। সেই রাজরাজ
চোড়, বরং করেছিলেন ঘটনাটির দ্ব্যর্থ্য নির্ণয়।

ঘটনাটির স্থান,—ভিক্রনাথপুর; ঘটনার নায়ক,—ভিক্র নম্বিকান্দের নম্বিকান্। কাল,—খ্রীষ্টাব্দ দশম শতাব্দীর শেষভাগ।

গ্রামটির নাম বিষয়ে একটি কাহিনী সুপ্রচলিত আছে। নারায়ণ নামে এক ব্রাহ্মণ শাপগ্রস্ত হয়ে সারসে রূপান্তরিত হ'ন। সারসদেহ ধারণ করে তিনি এখানে শিবের আরাধনা করতেন। তাই গ্রামটির নাম হয়, নাঠের উরু। তমিড়, ভাষায় নাঠের শব্দের অর্থ,—সারস। তার সঙ্গে উরু অর্থাৎ গ্রাম যুক্ত হয়ে হয়েছে নাঠেছুর।

গ্রামটির বাসু স্ক্যাও, থেকে এক কিলোমিটার দূরত্বে পৌছনো দ্বারে একটি গণেশ মন্দিরে।



মন্দিরটির নাম,—পোল্লাপ, পিল্লৈয়র কোট্টল।

এ মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন আনন্দের বিদ্যাসুরিয়ার। বিশেষ প্রয়োজনে কয়েকদিনের জন্য গ্রামবাসীর বেতে হওয়ার তিনি তাঁর বালকপুত্র নম্বিকান্দেরকে সেবতার পূজার ভার দিয়ে গেলেন। পূজার সময় উপস্থিত হলে নম্বি পূজার নৈবেদ্য

মৌলিক ও দুধ ঘেদীতে গণেশের পায়ের কাছে রেখে তাঁকে দেখলি খেয়ে নিতে আবেগন জানালো। গণেশ কিন্তু খেলেন না। নম্বি তখন নানাভাবে গণেশকে আহ্বানগ্রহণে উৎসাহিত করতে লাগলো। এমন কথাও বললো যে, গণেশ না খেলে তার বাবা তাকে দারুণ তিরস্কার করবেন, হয়তো তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়েও দিতে পারেন। গণেশ কিন্তু অচল, অটল। বিবুদ্ধে নম্বি তখন গণেশের পাথরের বৌদীতে ঝুঁকে নিজের মাথা ভেঙে কেলেতে উদ্ধত হলো। সহসা কেঁপে উঠলেন গণেশ মূর্তি। একহাতে আশ্বহত্যা থেকে নিরস্ত করলেন তিনি ব্রাহ্মণকুমারকে এবং অপর হাতে ছুঁয়ের পাখিটি তুলে নিয়ে নিঃশেষিত করলেন সেটি।

বালক মন্দির থেকে প্রসাদ নিয়ে ফিরলে ছুঁয়ের বাটি ঝালি দেখে তার মা জানতে চাইলেন দুধ কি হলো ?

নম্বি বললো, দুধ তো পিল্লৈয়র অর্থাৎ গণেশ খেয়ে নিয়েছেন। অবিশ্বাস্ত এই উক্তি শুনে নম্বির মা বললেন, চলতো দেখি।

মন্দিরে গিয়ে তাঁর তো চক্ষুস্থির। দেখলেন গণেশের মুখে ও তুঁড়ে তখনও দুধ লেগে রয়েছে। যেখানে এই বালক অর্চকের হাত কোনভুক্তমেই পৌছতে পারেনা।

দ্বিতীয় দিনেও নম্বির নিবেদিত দুধ একইভাবে পান করলেন দেবতা।

ঘটনাটির কথা অচিরে ছড়িয়ে পড়লো সারা গ্রামে। ক্রমে তা' গিয়ে পৌছলো ছায়ায় মাইল দূরবর্তী রাজধানী, তৎকালীন-এ। রাজরাজ চোড়-এর কানে সংবাদটি পৌছতেই তিনি ভিক্রনাথ-দুর্গ-এ গেলেন বিষয়টির সত্যতা নিৰ্ধারণের জন্য।

নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে এলেন তিনি রাজধানীতে। দিয়ে এছেন পোল্লাপ্, লিল্লেয়র্ এর সেনার জন্ত নানা উপঢৌকন ও সু-সম্পত্তি।—

ওরুপাইয়র্ এর এই মন্দির ও গণেশ বিগ্রহ আজও সগৌরবে বর্তমান। স্থানটি চিদম্বরম্ হ'তে সতেরো কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে।

একঘন্টা আগে দেখে এসেছি পোল্লাপ্, লিল্লেয়র্।

নমস্কারান্তে,
আপনার জামানার প্রতিমিথি

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

পত্রিকার অগ্রহারণ, '৮২ সংখ্যা থেকে **মনে পড়ে** নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে।

ভ্রমণকালে প্রত্যেককেই কত বিচিত্র ঘটনার সম্মুখীন হ'তে হয়। আপনাকেও মিস্ত্র হ'তে হয়েছে।

যে ঘটনা বা ঘটনাগুলি আপনার মনে রেখাপাত করে গেছে,—যা আজও আপনার মনে পড়ে,—সেইসব আনন্দ, বেদনা, বিষয়, কৌতুককর অভিজ্ঞতাগুলি প্রকাশের জন্য সংক্ষেপে লিখে পাঠান।

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

অসাধারণ কাব্য-গ্রন্থ

রঙিন মাছের ঘর

"রঙিন মাছের ঘরে" আমরা আশঙ্ক হতে আছি চারিদিকে ঘুর এক চতুর্দশে জায়গা দেখলে আমাদের দীর্ঘা শেষ, তার মাঝে কত উত্তরণ, কত দুঃখ প্রেম অনুরাগ বিহীন—



নীলাঞ্জনা প্রকাশনী

১, বৈকুণ্ঠ সাহা রোড,
কলিকাতা-৩২

জিৎশাস্ত্রা

। প্রথম ।

জয়শাস্ত্রের কিতাব যেতে পারি ?

— হুহুহুনাথ ভৌমিক, জয়নগর ।

শুকর-ক্ষেত্র নামে কোনও তীর্থ আছে নাকি ?

যাকলে ওখানের বিশেষ জট্টবা কি কি ?

— পরেশ ভট্টাচার্য, বড়নগর ।

। উত্তর ।

জগড়া—দিলী—যোধপুর । যোধপুর থেকে সরাসরি ট্রেন এ জয়শল্যের ।

আছে । পিতৃকর্ষ জ্ঞানাদির জন্য স্থানটি বিশেষরূপে চিহ্নিত । উত্তর প্রদেশের কাশ-গজ হতে সাত মাইল দূরত্বই সোরো-ই প্রাচীন শুকর-ক্ষেত্র ।

ওখানে একটি জলাশয় আছে যাতে স্নাতের অস্থি নিক্ষিপ্ত হয় এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তা' জলে মিশে যায় অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অবীহৃত হয়ে যায় । উক্ত জলাশয়, বরাহ-বিষ্ণুর মন্দির এবং শূর-কুণ্ড বিশেষ জট্টবা ।

আমি জৈন মন্দিরগুলির ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী । ভারতের কোথায় কোথায় জৈন ভাস্কর্য্যের নিদর্শন আছে তা' জানালে অত্যন্ত উপকৃত হবে ।

— নবীন নাগর, কলিকাতা ।

৩। নিম্নোক্ত স্থানগুলির জৈন মন্দিরগুলিতে ভাস্কর্য্যের নানা নিদর্শন পাবেন :

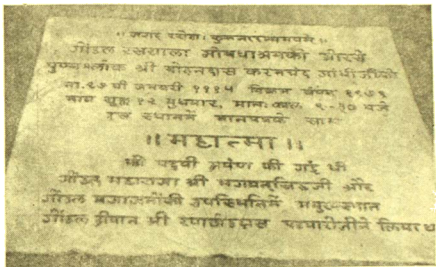
উদয়গিরি-বগুগিরি, ধওলি, পরেশনাথ, রাজগির, নালন্দা, পাণ্ড্যাপুরী, পাটনা, বৈশালী, কোশালী, বজ্রহাট, মথুরা, বিদিশা, চিতোর, রণকপুর, ঝালোড়, বোধপুর, মাউন্ট, আবু, তরঙ্গ পাড়াড়, গিরনার, পলিতানা, ভদ্রেশ্বর, ঈলোরা, দেওগড়, অমরাবতী, নারায়ণকোণা হোসপেট, চম্পা, কাকীপুর, মঙ্গলুর, কারকল, ঋবণ-বেলগোলা, মুদবিজি এবং সিতলনগরাসমূহ ।

জিজ্ঞাসা

ক্যাঠ সংখ্যা যাত্ৰিক পত্ৰিকা প্রকাশিত
গান্ধীজীর 'মহাত্মা' নামের স্থান গোতল
এই তথ্যটি আপনারা পেলেম কোথায় ?

—নন্দহুলাল পাল, বোলপুর।

নীচের ছবিটি দেখুন—



এ বছর পূজা সংখ্যা যাত্ৰিকে রথ প্রবেশের
দর্শনযোগ্য স্থানগুলিতে বেড়াতে যাওয়ার
একটি 'পথ-নির্দেশ' দিতে অজুরোধ জানাচ্ছি।

—জিতেন্দ্রনাথ সেনশর্মা, কলিকাতা।

অবশ্যই চেষ্টা করা হবে।

৬। পূজার ছুটিতে গুজরাটে যেতে চাই। ওখানের
দর্শনীয় স্থানগুলির নাম জানালে বাধিত হবো।

—অবেশভূষণ তরকবার, জলপাইগুড়ি।

৬। আহমদাবাদ, ডাবোই, ডাকোর, পাণজাগড়,
লুণল, পলিতানা, ভবনগর, জুনাগড়, সোমনাথ
(ভেরাওল), গির অরণ্য, পোরবন্দর, বেট-
দ্বারকা, নাগেশ্বর, জামনগর, সূর, নারায়ণ
সরোবর, কোটিশ্বর, অনুজার, জুহেশ্বর, পাটন,
সিধপুর, অখালী, কুস্তারিয়া, তরঙ্গ পাহাড়,
মুচুড়া, বেহু-রাজী, বড়গাঁ, কামলজী।

আপনারা যেসব স্থানে বাগছার পথ-নির্দেশ
যেন এবং 'জিজ্ঞাসা' বিভাগে যে যে স্থান সম্বন্ধে
পাঠকদের প্রশ্নের উত্তর মেন সেগুলি কি
আপনারা দেখেছেন ?
—সনৎ মণ্ডল, ডাঃমণ্ড হারবার ।

৭। প্রত্যেকটি স্থান সম্বন্ধে লেখা হয় সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ
অভিজ্ঞতা থেকে । জিজ্ঞাসা বিভাগে বর্তমানে
অপর রাষ্ট্রান্তর্গত যেসব প্রাচীন ভারতীয় স্থান-
সমূহের বিষয়ে লেখা হয় কেবলমাত্র সেগুলিই
আমরা দেখিনি ।

বুন্দি বাগছার পথ জানাবেন ?

—রণধীর মাইতি, ঝড়াপুর ।

হাওড়া-থেকে দিল্লী । দিল্লী হতে বোম্বাই
গামী ট্রেন-এ কোটা এবং সেখান থেকে
বাস-এ বুন্দি ।

—শ্রীমতী শুভা বহু



সম্পাদিকা : শ্রীমতী শুভা বহু

যাত্রিক পরিবর্তন পত্রিকার পক্ষে শ্রীমতী শুভা বহু কর্তৃক প্রিন্টিং, ১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬
হইতে মুদ্রিত এবং ৮/১১-৫৬, বীরগাড়া লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে প্রকাশিত ।

প্রধান কার্যালয় : ১৯, রামবোধান মার্গ লেন, হাওড়া-২ ।

ফোন : ২৫৮৭০০ গ্র্যাং : আবাসাণ ৪

বিতরণের সম্পাদক : শ্রী কমল কন্যোপাধ্যায়

ବିଜ୍ଞାନମେଢ଼ ହାର

ଟା:

ମୂର୍ତ୍ତି ମୂଳା

ସମ୍ପଦ ମୂଳା

ଝି ମୂଳା

କଳ୍ପ—୧ମ ମୂଳା

ଐ ୧୨ ମୂଳା

ଐ ୦୨ ମୂଳା

ଐ ୦୪ ମୂଳା

—

କର୍ମାଧ୍ୟାୟ

ସାହିତ୍ୟ

ମାସିକ୍ ମାସିକା

